নীল দরিয়ার দেশে

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

নীল দরিয়ার দেশে

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

নীল দরিয়ার দেশে

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

প্রকাশক
গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার-ঢাকা- ১২১৭

নীল দরিয়ার দেশে

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সার্বিক সহযোগিতায়

রাফীক বিন সাঈদী

অনুলেখক

আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশক

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার-ঢাকা- ১১০০

তৃতীয় প্রকাশ

২০০৯ ফেব্রুয়ারী

প্রথম প্রকাশ

২০০৫ সেপ্টেম্বর

অক্ষর বিন্যাস

শাকিল কম্পিউটার

৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ

মাসুদ সাঈদী

মুদ্রণে

আল আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬ শিরিসদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময়

১০০ টাকা মাত্র।

NEEL DORIAR DESHE BY MOULANA DELAWAR HOSSAIN SAYEDEE, CO-OPERATED BY RAFEEQ BIN SAYEDEE, TRANSLITERATION : ABDUS SALAM MITUL, PUBLISHED BY GLOBAL PUBLISHING NETWORK, 66 PARIDHASH ROAD, BANGLABAZER, DHAKA-1100. PRICE : 100 TK, ONLY IN BD, 4 DOLLER IN USA, 3 POUND IN UK.

উ|ৎ|স|র্গ

বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা
অধ্যাপক গোলাম আযম
যাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা
আমায় করেছে ঋণী

প্রসঙ্গ কথা

পৃথিবীর কয়েকটি মহাদেশের অর্ধশত দেশ সফর করলেও এতোদিন আমার মিসর সফর করা হয়নি। মিসর আমার স্বপ্নের দেশ, আমার প্রিয় তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআন ও সফর নামায়ে আরদুল কুরআন থেকে হযরত মূসা, হযরত ইউসুফ, হযরত সালেহ্, হযরত হারুন ও হযরত লূকমান আলাইহিমুস্ সালামের মিসর কেন্দ্রিক ঘটনা পড়ে পড়ে সেই যুবক বয়সেই কবে কখন মিসর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম এতোদিন পরে তা আজ মনে করতে পারছি না। মিসর সফরের কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েও ব্যস্ততার কারণে তা সফল হয়নি।

অবশেষে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী সাহিত্যের মিসরীয় অধ্যাপক আহ্মাদ ফৌজী ইবরাহীম ও কুরআনিক সাইন্স এবং ইসলামীক ষ্ট্যাডিস-এর অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন তালুকদার বাংলাদেশস্থ মিসরীয় রাষ্ট্রদুতের মাধ্যমে আমার কায়রো সফর চূড়ান্ত করলেন। সিদ্ধান্ত হলো আমরা সফর করবো এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে। সে মতে আমার পুত্রতুল্য স্নেহভাজন অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন ভিসা ও টিকেট সংগ্রহসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। ইত্যাবসরে কায়রো আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রদের একটি চৌকস গ্রুপ মিসরের উল্লেখযোগ্য সকল স্থানে আমাদের সফর সূচি ও যাতায়াতের সকল আয়োজন সম্পন্ন করলো।

এটিএন বাংলার ইসলামী অনুষ্ঠান মালার পরিচালক আমার একান্ত স্নেহাস্পদ আরকান উল্লাহ হারুনী আমার মিসর সফরের কথা জানতে পেরে মিসরের সকল ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলো ক্যামেরা বন্দী করে এটিএন বাংলার দর্শকদের উপহার দেয়ার জন্য আমাদের সফর সঙ্গী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলো। আমরা স্বানন্দে তাকে সফর সঙ্গী করে নিলাম। আমার বহুমুখী কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিন গুণতে গুণতে মিসর সফরের প্রত্যাশিত ০৭/০৪/০৫ তারিখ এসে উপস্থিত হলো এবং আমরাও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মিসর যাত্রা করলাম।

মিসর নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও আইয়ামে মুজ্তাহিদীনদের পদরেণু ধন্য দেশ। পৃথিবীর আশ্চর্যজনক স্থাপনা পিরামিডসহ অগণিত পুরাকীর্তি রয়েছে মিসরে। এজন্যই জাতিধর্ম নির্বিশেষে জ্ঞান পিপাসু মানুষের কাছে মিসর হলো স্বপ্নের দেশ। সকলের পক্ষে মিসর সফর করে জ্ঞানের পিপাসা মিটানো সম্ভব হয়না বিধায় পূর্ব থেকেই আমার পরিকল্পনা ছিলো মিসর সফর সম্পর্কিত আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা কলমবন্দী করে গ্রন্থাকারে আমার দেশের মানুষের কাছে পৌছাবো। আর ঠিক এ কারণেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের শ্রম কবুল করুন।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী
সাঈদী

اَوَ لَمْ يَسِيرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ط كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَاَخَذَ هُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ط وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ–

এ লোকগুলো কি (আমার) যমীনে বিচরণ করেনা? (বিচরণ করলে) তারা দেখতে পেতো, এদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিলো; অথচ, শক্তিমত্তার দিক থেকে (বলো) এবং যে সব কীর্তি তারা (এ) দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে, (সেদিক থেকে) যমীনে তারা ছিলো (এদের তুলনায়) অনেক বেশী প্রবল। (কিন্তু) আল্লাহ তা'য়ালা তাদের অবধ্যতার কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করলেন। (তখন) তাদের আল্লাহ তা'য়ালার গযব থেকে রক্ষা করার কেউই ছিলো না। (সূরা মু'মিন-২১)

সূচীপত্র

মিসরের পথে

জীবনের প্রথম যেদিন হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র নগরী মক্কায় যাত্রা করবো, সেদিন রাতে অন্যান্য দিনের মতো ঘুমাতে পারিনি। প্রকাশ করতে না পারা অপূর্ব এক আনন্দ-শিহরণে সারা রাত যেনো আধো ঘুমের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিলো। সে রাতকে আমার কাছে মনে হয়েছিলো এক দীর্ঘ রাত। কারণ এই রাত শেষ হলেই আমি যাত্রা করবো সেই ঘরের উদ্দেশ্যে—যে ঘরকে কেন্দ্র করে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে সিজ্‌দা দিচ্ছি, সেই ঘরকে নিজের চোখে দেখতে পাবো, সেই পবিত্র ঘরে আমার মালিক– আল্লাহ্ তা'য়ালাকে সিজ্‌দা দিতে পারবো। অপেক্ষার প্রহর যেনো আর শেষ হচ্ছিলো না। সেদিন মক্কা যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে আমার মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিলো, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।

মিসর যাত্রা করার পূর্ব রাতেও আমার মনে ভিন্ন এক অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিলো। মক্কা এবং মিসর– এই দুটো নামের প্রথম অক্ষর আরবী ভাষায় 'মিম', বাংলা ভাষায় 'ম' এবং ইংরেজী ভাষায় 'এম' হলেও এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে পরিমাপ করতে না পারা ব্যবধান। মক্কায় কা'বা ঘরে যাওয়া স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও শারীরিক দিক দিয়ে সক্ষম মুসলমানদেরকে মক্কায় গিয়ে হজ্জ আদায় করতেই হবে। আর মিসর বা অন্য কোনো দেশে যাওয়া মানুষের ঐচ্ছিক ব্যাপার। প্রথম যেদিন মক্কায় যাত্রা করবো সেদিনের অনুভূতি আর মিসরে যেদিন যাত্রা করবো, সেদিনের অনুভূতির মধ্যেও ছিলো বিশাল ব্যবধান এবং প্রথম মক্কায় যাত্রা করার দিনের অনুভূতির সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না।

তবুও সেদিন ফজরের সময় ঘুম ভাঙ্গার পরে এক ভিন্ন অনুভূতি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলাম। কারণ মিসর এমন একটি দেশ– যে দেশটি প্রাচীন সভ্যতার লালন ভূমি। আল্লাহ্ তা'য়ালা হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে এই দেশের ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করার তাওফীক দিয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনে যে সকল সম্মানিত নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৬ জনের নামে আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের সূরার নামকরণ করেছেন। ১১ পারায় সূরা ইউনুস ও সূরা হূদ, ১২ পারায় সূরা ইউসুফ, ১৩ পারায় সূরা ইবরাহীম, ২৬ পারায় সূরা মুহাম্মাদ এবং ২৯ পারায় সূরা নূহ। সূরা ইউসুফে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের জীবনে সংঘটিত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ঘটনা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজেই বলেছেন, 'আহ্‌সানুল কাসাস' বা সর্বোত্তম কাহিনী।

এই মিসরের সাথে যেমন জড়িত রয়েছে নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, যুগ শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরাম ও পৃথিবী বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের ঘটনাবলী, তেমনি জড়িত রয়েছে আল্লাহর বিদ্রোহী বান্দা ফিরআউন ও তার অনুসারীদের কাহিনী। পৃথিবীর আশ্চর্যজনক স্থাপনা পিরামিডও এই মিসরেই অবস্থিত। আল্লাহ তা'য়ালা বিশাল জলধির মধ্য দিয়ে পথ সৃষ্টি করে হযরত মূসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে ফিরআউনের হামলা থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং স্বয়ং ফিরআউন ও তার দলকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন, সেই জলধি– নীল দরিয়াও এই মিসরের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। এ ধরনের আরো অনেক কারণেই মিসর ভ্রমণ করার ইচ্ছে ছিলো দীর্ঘ দিনের এবং এ জন্যই মিসর যাত্রা করার দিনে আমার মনে এক ভিন্ন অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিলো।

২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে সকালের নাস্তা সেরে পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকা কুর্মিটোলা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের দিকে রওয়ানা হলাম। আমার সফর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর গিয়াস উদ্দীন তালুকদার ও টিভি চ্যানেল এটিএন বাংলার ডাইরেক্টর স্নেহাস্পদ আরকানুল্লাহ্ হারুনী। ভিআইপি ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আরব আমিরাতের ৫৩৮ নং ফ্লাইটে আমরা উঠে যার যার জন্য নির্ধারিত সীটে বসলাম। কিছুক্ষণ পর ককপিট থেকে লাউড স্পীকারে জানানো হলো সীট বেল্ট বাঁধার জন্য। আমরা যথারীতি সীট বেল্ট বাঁধলাম। সকাল দশটা পনের মিনিট– সকালের সোনালী রোদে মহান আল্লাহর অনেকগুলো বান্দাকে গর্ভে ধারণ করে আরব আমিরাতের সুপরিসর বিমানটি সুনীল আকাশে ডানা মেলে দিলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালে যেসব দোয়া পড়তেন, তা পাঠ করে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সাহায্য চাইলাম। বিশাল আকাশের শূন্যমার্গে তুলার মতো সাদা নরম মেঘের ওপর দিয়ে উড়োজাহাজ আমাদেরকে নিয়ে দুবাইয়ের দিকে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। একটানা দীর্ঘ চার ঘন্টা আকাশে ওড়ার পর দুবাই এয়ার পোর্টে আমাদেরকে নিয়ে আরব আমিরাতের ফ্লাইটটি অবতরণ করলো। দুবাইয়ে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসে আমাদের যাত্রা বিরতির কথা পূর্বেই জানানো হয়েছিলো। দূতাবাস কর্তৃপক্ষ দুইজন প্রটোকল অফিসারকে এয়ারপোর্টে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এয়ার পোর্টের অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদে নিয়ে গেলেন। আমরা যোহর-আসর এক সঙ্গেই আদায় করলাম। সফরকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এভাবে নামায আদায় করতেন।

এরপর দুপুরের খাওয়া শেষ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করার পর আরব আমিরাতের আরেকটি সুপরিসর জাম্বো জেট-এ উঠে বসলাম। বিশাল জাম্বো জেট স্বগর্জনে আকাশে উড়ে নীল দরিয়ার দেশ- মিসরের রাজধানী কায়রোর দিকে যাত্রা করলো। একটানা চার ঘন্টা আকাশে ওড়ার পর স্থানীয় সময় বিকাল পাঁচটায় কায়রো এয়ার পোর্টে জাম্বো জেট অবতরণ করলো। আমি জীবনের এই প্রথম আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ ও হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের দেশে পা রাখলাম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে তাঁর এই গোলামকে পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক দেশে নিয়ে গিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের ছোট-বড় অনেকগুলো এয়ার পোর্ট দেখার তাওফীক দিয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে তুলনামূলকভাবে মিসরের এয়ার পোর্ট অপরিচ্ছন্ন বলে মনে হলো। পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো পরিচ্ছন্নতার বেশ অভাব– শুধু তাই নয়, ইমিগ্রেশন সিস্টেমও তেমন সুবিধাজনক বলে মনে হয়নি।

মিসরের ভৌগোলিক অবস্থা

বিশ্বের মানচিত্রে বর্তমানে মিসরের অবস্থান হলো, মিসরের উত্তর-পূর্ব অংশ পড়েছে আফ্রিকা মহাদেশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ পড়েছে এশিয়া মহাদেশে। তবে অধিকাংশ ভাগই পড়েছে আফ্রিকা মহাদেশে। এ দুই মহাদেশের মিলন বন্ধন হিসেবে কাজ করছে বিখ্যাত সিনাই পর্বত। মিসরের অধিকাংশ ভূমিই মরুপ্রান্তর। মিসরের উত্তরে রয়েছে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে সুদান, পূর্বে লোহিত সাগর ও ইসরাঈল নামক রাষ্ট্র– যা মুসলিম বিশ্বের বিষফোড়া এবং পশ্চিমে রয়েছে লিবিয়া। উত্তর-দক্ষিণে সর্বোচ্চ ১,০৫৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ এবং প্রায় ১,২৫৫ প্রশস্ত। ভূমির সর্বমোট আয়তন প্রায় ১,০০১,৪৫০ বর্গ কিলোমিটার। ভূমির সর্বোচ্চ উচ্চতা তুরে সিনাই পর্বতে। সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৮,৬৫২ ফুট। শতকরা ১০ ভাগেরও কম অংশ উর্বর ভূমি এবং শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী মরুভূমি। এর মধ্যে পশ্চিমে লিবিয় মরুভূমি, সাহারা মরুভূমির একটি অংশ এবং পূর্বাংশে রয়েছে আরব মরুভূমি, লোহিত সাগর ও সুয়েজ ক্যানেল।

মিসরের আবহাওয়া খুবই মনোরম। ইংরেজী মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল এবং নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত শীতকাল। উপকূলীয় এলাকায় গড় তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস থেকে ১৩ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করে। আর মরুভূমি এলাকার গড় তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রী থেকে ৬ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানাম করলেও কোনো কোনো সময় শূণ্য ডিগ্রী সেলসিয়াসেও নেমে আসে।

মিসরে প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে স্বর্ণ, লাল গ্রানাইট পাথর, সবুজ পাথর, লোহিত সাগরের উপকূলে পেট্রোলিয়াম, ফসফেট, ম্যাঙ্গানিজ, ইউরোনিয়াম এবং মাটির নীচের গ্যাস উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ।

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত মিসর এই বিস্তীর্ণ মহাদেশের একটি ক্ষুদ্র দেশ হলেও এই দেশটি পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন সভ্যতার দেশ। বর্তমান মিসরের মোট ভূমির মধ্যে ৫ শতাংশ জমি বাস বা কৃষিযোগ্য এবং অবশিষ্ট সমগ্র অংশ মরুভূমি। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ৭ মিলিয়ন, এ দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম হলেও এদেশে খৃষ্টানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তারাও এদেশে মুসলিমদের অনুরূপ অধিকার ভোগ করে থাকে। মিসরের সমস্ত কৃষিযোগ্য ভূমি নীল নদ উপত্যকা ও পলিমাটি সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এই অঞ্চলেই নদীর উভয় তীরে ১০ মাইলের মধ্যে মিসরের ৯৯ শতাংশ মানুষ বাস করে। অবশিষ্ট ভূমি কৃষির অনুপযুক্ত, অনুর্বর বালুকাময় প্রধানত শুষ্ক। এখানে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে সামান্য ৮ ইঞ্চি অথবা তার থেকেও কম বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক জে,ডি ফেজ মিসরের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন, মিসর দেশটি বিশাল মরুভূমির মধ্যে একটি মরুদ্যান বিশেষ এবং এখানে প্রত্যেক বছর নীল নদের বন্যার কারণে ভূমি খুবই উর্বর থাকে। মূল মিসর আসওয়ান থেকে কায়রো নগরী পর্যন্ত ১০ মাইলেরও অধিক প্রশস্ত ও ৭০০ মাইলেরও বেশী লম্বা এক ভূখন্ড। নীল নদের উভয় তীরের পর্বতসমূহ ৪০০ থেকে ১২০০ ফুট উঁচু। এর জমা পলিমাটি কয়েক ফুট থেকে আরম্ভ করে অনেক গভীরে সঞ্চিত রয়েছে। এই দেশটির দুই দিকে অর্থাৎ পূর্বে ও পশ্চিমে মরুভূমি থাকায় সেই প্রাচীনকালে পণ্য সুষ্ঠুভাবে আমদানী-রফতানী করার জন্য নদী পথই ছিলো একমাত্র পরিবহণ।

মিসরে কাঠের অভাবের কারণে দেশটি কখনোই সামুদ্রিক দিক থেকে তেমন শক্তি অর্জন করতে পারেনি। মিসরীয়রা বিদেশী জাহাজে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরে ব্যবসা-বাণিজ্য নির্বাহ করতো। অপরদিকে প্যাপিরাসের আঁটিতে তৈরী নৌকাতে মিসরীয়রা আফ্রকার দূর অঞ্চল নুবিয়া অর্থাৎ উত্তর সুদান–যা হযরত লূকমান আলাইহিস্ সালামের দেশ হিসেবে পরিচিত, সেখানে যাতায়াত করতো। এখানেই স্যামিটিক জাতির লোকজন সুদানের নিগ্রো অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসে। ঐতিহাসিকদের মতে মিসরের বাণিজ্যিক ও সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হয় খৃষ্ট পূর্ব ২৫০০ শত বছর থেকে। প্রাচীনকালে মিসরীয়রা দেশটিকে ট্যানি বা দুটো দেশ অর্থাৎ উচ্চ মিসর ও নিম্ন মিসর নামে অভিহিত করতো।

ইজিপ্ট বা মিসর নামকরণ

মিসরের সেচ বিধৌত কালো মাটির জন্য তারা এ দেশকে 'কেমী' বা কৃষ্ণ দেশ ও নীল নদের উভয় তীর সংলগ্ন মরুভূমি অঞ্চলকে 'টেসার' বা লাল মাটির দেশ বলতো। সমগ্র দেশটির রাজনৈতিক নামকরণ হয়েছিলো 'টা-মেরা' বা বন্যার দেশ। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক এ্যাপোলোডোরাস লিখেছেন যে, ইজিপ্টস নামক এক শক্তিশালী ব্যক্তি কালো পা-ওয়ালাদের সমগ্র দেশ বিজয় করেন এবং নিজের নামানুসারে দেশটির নামকরণ করেন 'ইজিপ্টস্'।

অপরদিকে বাইবেলে মিসরকে বলা হয়েছে 'মিজরেম' যা অনেক ঐতিহাসিকের মতে মিসরের সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক বিভাগ উত্তর ও দক্ষিণের দ্যোতক। বাইবেলের ভাষ্যানুসারে মিসরীয়দের উৎপত্তি হলো, হ্যাম-এর পুত্রেরা ছিলো কুশ, মিজরেইম, ফুট ও ক্যান্নান। এই মিজরেইম থেকেই মিসর নামকরণ হয়েছে। আবার প্রাচীন ঐতিহাসিক ডিওডোরাস বলেন, মিসরে বসতি স্থাপনকারী ইথিওপিয়দের থেকেই মিসরীয়দের উৎপত্তি হয়েছে। অপরদিকে হোমার-এর ইলিয়াড ও ওডিসি-তে ইথিওপিয়ার উল্লেখ দেখা যায়। হোমার ইজিপ্ট শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন নীল নদ ও এই নদের পানি বিধৌত দেশ বুঝানোর জন্য। কেউ বলেছেন, মেম্ফিসের প্রাচীন নাম কপটিক শব্দ 'হেকাপ্টা' থেকে উদ্ভূত। এই গ্রীক শব্দ থেকেই ল্যাটিন 'ইজিপ্টাস' শব্দের উৎপত্তি। সেন্ট এ্যান্টা ডিওপ-এর মতানুসারে সেমেটিক ঐতিহ্য অনুসারে প্রাচীন মিসরের লোকজন ছিলো অন্যান্য দেশের কালো লোকদের মতোই কালো বর্ণের। ঐতিহাসিক নেভেল-এর মতে প্রাচীন মিসরের লোকজন ধারণা করতো, প্রত্যেক বছর যে বন্যা হয়, এই বন্যার একজন দেবতা রয়েছে, তারই নাম এ্যাজেব। এই এ্যাজেব নাম থেকেই 'ইজিপ্ট' নামকরণ হয়েছে, যার অর্থ হলো বন্যার দেশ।

আদি মিসর ছিলো তৃণ, কৃষি ও বনভূমিতে পরিপূর্ণ। সে সময়ের আর্দ্র জলবায়ুতে জলে স্থলে বর্তমানে লুপ্ত নানা ধরনের জীবজন্তু বিরাজ করতো। এর নিদর্শন পাওয়া যায় নীল নদ সন্নিহিত পর্বতগাত্রের চিত্রাঙ্কনগুলোয়। অনেক শিকারের ছবিতে জীবজন্তু, হাতী, জলহস্তী, জিরাফ ও গাধার সাথে আফ্রিকার তৃণভোজী জীবজন্তু দেখা যায়। সুদক্ষ ধীবর ও অন্যান্যদের মরুভূমিতে সিংহ, বন্য ষাঁড় ইত্যাদি জীবজন্তুকে শিকার করার ছবিও দেখা যায়। নদীতে ডিঙি নৌকায় আমাদের দেশের অনুরূপ কুচ, টেটা বা বর্শা দিয়ে জলহস্তী, কুমির বা বড় ধরনের মাছ শিকারের চিত্রও এসব

চিত্রাঙ্কনগুলোয় খোদিত করা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বছর পর্যন্তও মিসরে বহিরাগত জীবজন্তু বিচরণ করতো। এরপর ক্রমশ এসব জীব-জানোয়ার আরো দক্ষিণে আফ্রিকার তৃণ ও বনভূমির দিকে চলে গিয়েছে।

আধুনিক মিসরের প্রশাসন

মিসরের বর্তমান রাষ্ট্রীয় নাম আরব প্রজাতন্ত্র মিসর। শাসন পদ্ধতি প্রেসিডেন্টসিয়াল, গণভোটের মাধ্যমে প্রতি ৬ বছর পর পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৫৪ আসনের পার্লামেন্ট গঠিত হয় ৫ বছর মেয়াদের জন্য, এর মধ্যে অবশ্যই কিছু মহিলা সদস্য থাকতে হবে। এই ৪৫৪ জন সদস্যের মধ্যে ৪৪৪ জন জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে এবং অবশিষ্ট ১০ জনকে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দান করবে। এরপর রয়েছে ২৬৪ জন সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ। এর মধ্যে ১৭৬ জন সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবে এবং অবশিষ্ট ৮৮ জন সদস্যকে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন দান করবে।

বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইসলামী, ফ্রেঞ্চ এবং ইংলিশ আইন অনুযায়ী বিচার কার্য সম্পন্ন করা হয়। সুপ্রিম কনস্টিটিউশনাল কাউন্সিল হচ্ছে সর্বোচ্চ জুডিশিয়াল বডি, আদালতের জুরিস্‌ডিকশন বা ক্ষমতা চারভাগে বিভক্ত।

আরব বিশ্বের মধ্যে মিসরের সামরিক শক্তি খুবই উন্নত ও শক্তিশালী। ১৯৯৮ সালের হিসাব অনুসারে সামরিক বাহিনীতে রয়েছে ৩২০,০০০ সৈন্য, বিমান বাহিনীতে রয়েছে ৩০,০০০ সৈন্য এবং নৌবাহিনীতে রয়েছে ২০,০০০ সৈন্য। ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে সকল যুবককে অবশ্যই সামরিক প্রশিক্ষণ করতে হবে। মিসর সরকারের নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে এবং এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩৬ মাস পর্যন্ত হতে পারে।

ইংরেজী ২০০০ সালের হিসাব অনুসারে আফ্রিকা মহাদেশের মিসর নামক এই দেশটির জনসংখ্যা প্রায় প্রায় ৭ মিলিয়ন তা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। জনবসতি অন্যান্য এলাকায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৯ জন হলেও নীলনদের উভয় পাশে জনবসতি প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,৯০০ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৮%, বার্ষিক জন্ম হার প্রতি হাজারে ২৭.৩১ জন, মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৮.৪১ জন এবং দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে ২৩% মানুষ। শিক্ষাঙ্গনে ইংরেজী ও ফ্রেন্স ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। রপ্তানী হয় প্রায় ৫.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানী করা হয় ১৫.৫ মার্কিন ডলার। প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী লেবেল পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেয়া

হয়। ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক। প্রায় ৫১ ভাগ যুবক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। মিসরে বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৩ টি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের কোনো সুযোগ ছিলো না। ১৯৬২ সাল থেকে ছাত্রী ভর্তি শুরু হয় এবং বর্তমানে মেয়েদের জন্য পৃথক ক্যাম্পাস রয়েছে।

অপরাহ্নের আলোয় মিসরের মাটিতে

আমার মিসর সফরের সংবাদ ইতোমধ্যেই মিসরের জামে আল আযহারে অধ্যয়নরত বাংলাদেশীদের কাছে পৌছে গিয়েছিলো। মিসরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী হবে বাংলাদেশের দুটো স্বনাম ধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা'মিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা ও নরসিংদীর জামেয়া কাসেমিয়ার ছাত্র। কায়রো এয়ার পোর্টে বিভিন্ন টুরিস্ট এজেন্সির অফিস রয়েছে। এদের লোকজন এয়ার পোর্টে টুরিস্ট ধরার জন্য ঘুরে বেড়ায়। এরা টুরিস্টদের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং আগ্রহভরে স্বাগত জানায়। মিসরের বৈদেশিক মুদ্রার উল্লেখযোগ্য অংশ আসে টুরিস্টদের পকেট থেকে।

ইমিগ্রেশনে বিরক্তিকর ঝামেলা শেষ করে এয়ার পোর্টের বাইরে এসে দেখি বাংলাদেশের যশোর জেলার আব্দুল কাদের, নোয়াখালী জেলার সাইফুদ্দিন, লক্ষ্মীপুর জেলার মোঃ মুঈনুদ্দিন ও চাঁদপুর জেলার কাজী বেলাল হোসাইন এবং আরো অনেকে অধির আগ্রহে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ফুলের তোড়া হাতে অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে দেখতে পাওয়া মাত্র ওদের সকলের চেহারায় আনন্দের হাসি ফুটে উঠলো। আমরা একে একে উপস্থিত সকলের সাথে সালাম বিনিময় করে বুকে বুক মিলালাম এবং আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য যে গাড়ি আনা হয়েছিলো, তাতে উঠে বসলাম।

কায়রো বিমান বন্দরের বাইরে এসে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া অনুভব করলাম। পরিবেশগত দিক দিয়ে সারা মিসরের তাপমাত্রা একই ধরনের নয়। বড় বড় নগরী যেমন কায়রো, আলেক্সান্দ্রিয়া, ইল মিনইয়া, লাক্সর, আসওয়ান, পোর্ট সাঈদ, ইসমাঈলিয়া, হারঘাডা, রাফাহ্, আল আরিস, সেইন্ট ক্যাথরিন, ইল টুর, সাম ইল শেখ ও হালাইব এলাকার তাপমাত্রা বছরের সকল মৌসুমে একই ধরনের থাকে না। এপ্রিল মাসে সাধারণত কায়রো এলাকার তাপমাত্রা ১৩ থেকে ২৮ ডিগ্রীর মধ্যে ওঠা-নামা করে।

কায়রোর আব্বাসিয়া এলাকায় একটি সুসজ্জিত বাড়ির সপ্তম তলা ভাড়া নিয়ে সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। ধুষর রঙের বাড়িটির প্রবেশ পথে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জামে আল আযহারের ছাত্রবৃন্দ অপেক্ষা করছিলো। তাঁদের সাথে সালাম ও কুশল বিনিময় করে লিফ্‌ট-এ উঠে সপ্তম তলাতে পৌঁছে দেখি সেখানেও ছাত্ররা অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছে। এদের সার্বিক আয়োজনে একজন নিপুন শিল্পীর দক্ষতা লক্ষ্য করলাম। সপ্তম তলার পরিবেশ সপরিবারে থাকার মতোই। প্রত্যেকটি কক্ষই সুসজ্জিত এবং সাজানোর ধরনে আভিজাত্য আর সুরুচির প্রকাশ স্পষ্ট।

উপস্থিত সকলের সাথে কথাবার্তার ফাঁকে হালকা নাস্তা সেরে মাগরিব ও এশার নামায আদায় করলাম। দীর্ঘ ভ্রমণে আমরা সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুচোখ ভেঙ্গে যেনো ঘুম নেমে আসছিলো। ঘুমের আমেজে বার বার হাই উঠছিলো। আমাদের অবস্থা অনুভব করে উপস্থিত সকলেই সেদিনের মতো বিদায় গ্রহণ করলো। আমরা আমাদের জন্য নির্ধারিত কক্ষে চলে গেলাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে দেশেও বাড়ির বাইরে এবং বিদেশেও যেখানেই নিয়েছেন, সেখানে পৌঁছে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা আমার জন্য নিয়মে পরিণত হয়েছিলো। মিসরে পৌঁছেও এর ব্যতিক্রম হলো না। বিছানায় যাবার পূর্বে দক্ষিণ দিকের জানালা পথে বাইরের দিকে তাকালাম।

হযরত ইউসুফ ও হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের চারণভূমি মিসরের রাতের পরিবেশ দেখছি। সম্মানিত এই দুইজন নবী-রাসূল যখন এই মিসরের পথে-প্রান্তরে তাঁদের পবিত্র কদম রেখেছেন, তখন ছিলো সে যুগের উপযোগী পরিবেশ। বর্তমান কালের মতো আধুনিক কৌশলে নির্মিত রাস্তা আর অট্টালিকা ছিলো না, রাতের অন্ধকারে প্রয়োজন পূরণের জন্য ভিন্ন কৌশলে আলোর ব্যবস্থা করা হতো। বিজ্ঞানের হিরণময় কিরণে উদ্ভাসিত বর্তমান যুগের মতো সে সময় বিদ্যুতের ব্যবস্থাও ছিলো না। আমি যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি, সেদিকেই বিদ্যুতের ঝলকানি– আলোর ছটায় রাস্তা-পথ আর বিশাল অট্টালিকাগুলো যেনো বর্তমান বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘোষণা করছে। এসব কিছু ছাপিয়ে আমার মনে পড়লো পবিত্র কোরআনের সেই আয়াত–যেখানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেকটি জিনিস যা পৃথিবীতে রয়েছে, ধ্বংসশীল এবং কেবলমাত্র তোমার মহিয়ান-গরিয়ান রব্-এর সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে।' (সূরা রাহ্মান-২৬-২৭)

এভাবে কিয়মাতের বর্ণনা সম্বলিত অনেক আয়াতই একের পর এক মনে পড়লো। এই গগনচুম্বী অট্টালিকা ও বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার, কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। এসবকিছুই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। মিসরের রাজধানী কায়রোর অভিজাত এলাকা আব্বাসিয়া– চারদিকেই আলোর বন্যা। কিন্তু এই আলোর পেছনেই রয়েছে অন্ধকার। মানুষ সাধারণত যা দৃশ্যমান তাই নিয়েই মেতে ওঠে। দৃশ্যমানের আড়ালের দিকটি মানুষের দৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না এবং এ জন্যই আড়ালের দিকটি নিয়ে মানুষ তেমন চিন্তা-গবেষণাও করে না। মানুষের হাতে নির্মিত দৃশ্যমান এসব অট্টালিকা আর বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের দিকেই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু এগুলোর পেছনে অদৃশ্যমান ধ্বংস গহ্বর অপেক্ষা করছে, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি নেই। যদি থাকতো, তাহলে বর্তমানে মানুষ সাময়িক স্বার্থের টানে এভাবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতো না।

দীর্ঘক্ষণ ধরে জানালা পথে বাইরের দৃশ্য দেখা সম্ভব হলো না। ভ্রমণ জনিত ক্লান্তির কারণে ঘুমের আবেশ আমাকে বিছানায় যেতে বাধ্য করলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস্ সালাম রাতে ঘুমানোর পূর্বে পবিত্র কোরআনের যে সকল সূরা পাঠ করতেন এবং নিজ থেকে দোয়া করতেন, তা পাঠ করে চোখ বন্ধ করলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

কায়রো নগরী

মিসরের রাজধানী শহরের নাম কায়রো। এই নগরী পৃথিবীর বড় বড় শহর গুলোর অন্যতম। ঐতিহাসিক নীলনদের দুই কূলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আধুনিক [illegible] নগরী। মিসরের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিলো মেম্ফিসেস–রাজা মিনা ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজাই ছিলেন প্রথম রাজা– যিনি উচ্চ মিসর ও নিম্ন মিসরকে একত্রিত করেছিলেন। মিনা নামক রাজাই সর্বপ্রথম পিরামিড নির্মাণে পাথর ব্যবহার করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন এবং তিনিই সাক্কারা পিরামিড নির্মাণ করেন। এরপরে রাজধানী স্থানান্তর হয় থীবেস-এ। এভাবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে মিসরের রাজধানী হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে কায়রো নগরীকে।

কায়রো হলো বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বড় ও পুরনো সভ্যতার নগরী। মিসরীয়রা কায়রো সম্পর্কে এখনও গর্বভরে বলে থাকে, 'পৃথিবীর সমস্ত শহরের মা'। এই নগরী সম্পর্কে আরেকটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে, 'হাজার মিনারের নগরী'। প্রকৃত অর্থেই

কায়রো নগরীতে রয়েছে আকাশচুম্বী অসংখ্য কারুকার্যময় মিনার। প্রত্যেকটি মিনারের নির্মাণশৈলী, নকশা, স্থাপত্যকলা মনোমুগ্ধকর। কায়রো শহরের কেন্দ্র থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরেই রয়েছে গিজা বা জিযা পিরামিড। মিসর হলো যাদুঘরের শহর, শুধু তাই নয়, পুরো মিসরই যেনো একটি যাদুঘর।

মিসরের সরকারের পর্যটন কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত গাইড বুকে কায়রো নগরী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই নগরী আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে সবথেকে বড় নগরী। এই রাজধানী শহরে বর্তমানে বসবাসকারী লোক সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই কোটি। নগরীর রাস্তা-পথগুলো ইউরোপ-আমেরিকার প্রশস্ত রাস্তা-পথের অনুরূপ এবং এ ধরনের প্রশস্ত রাস্তা আমি ইতোপূর্বে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে দেখেছি। রাস্তা-পথে যেনো যানজটের সৃষ্টি না হয় এ জন্য নির্মাণ করা হয়েছে বহু সংখ্যক সুদীর্ঘ ফ্লাই ওভার। নগরীর অধিকাংশ স্থাপনা ধূষর বর্ণের– যা আমার কাছে দৃষ্টি নন্দন মনে হয়নি। শহরের দালান-কোঠা দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে, হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের যুগে বন্যায় তলিয়ে যাবার পর এসব স্থাপনার ওপর আর রঙের প্রলেপ দেয়া হয়নি।

কায়রো বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে যখন মূল শহরের দিকে যাত্রা করলাম, তখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো ব্যবহৃত পলিথিন। রাস্তা-পথে এবং শহরে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য ব্যবহৃত পলিথিন ব্যাগ– যা পর্যটকদের কাছে বিরক্তিকর দৃশ্য বলেই বিবেচিত হবে। এসব দিকে যদি নগর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পড়তো, তাহলে কতই না ভালো হতো। পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য বিলাস বহুল ফাইভ স্টার ও থ্রী স্টার হোটেল, বিনোদন কেন্দ্র, ক্লাব ও পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে নীলনদের দুই তীরে– যা সহজেই পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

নীলনদে ভাসমান রাখা হয়েছে সুসজ্জিত ও বিলাস সামগ্রীতে পরিপূর্ণ প্রমোদ তরী। এসব প্রমোদ তরীগুলো প্রতি নিয়ত দেশ-বিদেশের পর্যটকদেরকে হাতছানি দিচ্ছে। মিসর সরকারের আয়ের প্রধান উৎসই হলো পর্যটন। এ জন্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করার এবং তাদের মনোরঞ্জন করার উপকরণ দিয়ে এসব প্রমোদ তরী সাজানো হয়েছে। কায়রো নগরী বা অন্য কোনো শহরের বাইরে যেদিকেই যাওয়া যাবে সেদিকেই বিশাল বিশাল সড়ক তৈরী করা হয়েছে। এ কারণে কোথাও এমন একটি বিরক্তিকর যানজট নজরে পড়েনি– যা আমাদের দেশের রাজধানী ও বিভাগীয় শহরে বসবাসকারী জনগণের নিয়তিতে পরিণত হয়েছে। বিশাল রাস্তাগুলোর মধ্য রয়েছে

ডিভাইডার, এক পাশ দিয়ে গাড়ি আসছে আরেক পাশ দিয়ে যাচ্ছে। যাওয়া আসার পথে রয়েছে ৫ টি করে লেন, দুই পাশের লেন বেয়ে ১০ টি করে গাড়ি ডিভাইডারের সীমানা রক্ষা করে যাতায়াত করছে নিয়ম মাফিক গতিতে।

আমি লক্ষ্য করলাম, গাড়ির চালকগণ ও পথচারী সকলেই ট্রাফিক আইন-কানুন অনুসরণ করছে এবং পথচারী যথাস্থান দিয়ে পথ অতিক্রম করছে। আমাদের দেশের মতো কোথাও রাস্তা খোঁড়াখুড়ি নেই, ঢাকনা বিহীন একটি ম্যানহোলও নেই। আমাদের দেশে যেমন কর্তৃপক্ষের কোনো কর্তা ব্যক্তি বা টহলদারদের সন্তুষ্ট করে ফুটপাত দখলে নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের সামগ্রীর পসরা বসিয়ে পথচারীদেরকে অনিবার্য দুর্ঘটনার দিকে ঠেলে দেয় বা যানজটের সৃষ্টি করে, আমার চোখে তেমন কোনো দৃশ্য মিসরের রাজধানী কায়রোসহ বড় শহরগুলোর সড়ক পথে নজরে পড়েনি। এসব কারণে সেখানে দুর্ঘটনার সংখ্যা অনুল্লেখযোগ্য।

জামে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে

মিসরের বুকে আমার জীবনের প্রথম রাত ভালোভাবেই অতিবাহিত হলো। ফজরের ওয়াক্তে ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই মহান আল্লাহর শোকর আদায় করে ফজরের নামাযের জন্য প্রস্তুত হলাম। ইতোমধ্যেই আমার সফর সঙ্গীরাও নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমরা সকলে জামায়াতে নামায আদায় করে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় এক ঘন্টারও বেশী ঘুমালাম। ঘুম থেকে জেগে গোসল সেরে নাস্তা করলাম। জানালা পথে বাইরে তাকিয়ে দেখি রাতের সেই কৃত্রিম আলোর ঝলকানি আর নেই- সূর্যের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। সকালের সোনালী রৌদ্রের কিরণ যেনো তরল সোনার মতোই ছড়িয়ে পড়ছে।

সেদিন ছিলো ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের ৭ তারিখ। বাইরে বের হবার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হলাম, পূর্বেই নির্ধারিত ছিলো আজ আমরা কোন্ কোন্ দর্শনিয় স্থানসমূহ দেখতে যাবো। জামে আল আযহারে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের যশোর জেলার আব্দুল কাদের ছিলো আমাদের গাইড। ইতোমধ্যেই সে আমাদের কাছে পৌছালো। লিফট-এ উঠে সপ্তম তলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ নেমে বাসার সম্মুখে গাড়ি পার্কের স্থানে এসে গাড়িতে উঠে বসলাম। প্রশস্ত পীচঢালা কালো পথ বেয়ে গাড়ি এগিয়ে চললো পৃথিবীর প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ জামে আল আযহারের দিকে।

সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা এসে পৌছলাম হোসাইনিয়া এলাকায় অবস্থিত মসজিদুল আযহার-এ। এই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে, হযরত ইমাম হোসাইন

রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নামের সাথে মিল রেখে। এখানে হোসাইনী মসজিদ নামে একটি মসজিদও রয়েছে। এখানে রাস্তার পশ্চিম পাশে রয়েছে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি ও প্রধান ক্যাম্পাস এবং মসজিদু আযহার। এই মসজিদু আযহারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের অন্যতম পাদপ্রদীপ জামে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবৃন্দ যেমন আসে অধ্যয়ন করার জন্য, তেমনি গবেষকবৃন্দও এখানে আসেন গবেষণা করার জন্য। এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন ফাতেমী বংশের খলীফা মুয়েয লে-দিনিল্লাহ্। ৩৬১ হিজরী মোতাবেক ৯৭২ ঈসায়ী সালে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ব্যাপারে ভিন্ন মতও রয়েছে। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, মিসরের ফাতেমী খলীফা ময়েয লে-দিনিল্লাহ্র শাসনামলে খলীফা কর্তৃক ৩৫৯ হিজরী ২৪ শে জুমাদিউল উলা মোতাবেক ৪ ঠা এপ্রিল ৯৭০ খৃষ্টাব্দে জামে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, ফাতেমী খলীফা ময়েয লে-দিনিল্লাহ্র ক্রীতদাস জাওহার আল কাতিব যখন কায়রো নগরী আবাদ করেন, তখন তিনি মসযিদু আযহার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুসারেই এই মসজিদ ও আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে। আবার আরেক ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার নামের জাহ্রা শব্দ থেকে আল আযহার নাম স্মরণ করে মসজিদু আযহার নামকরণ করা হয়েছে। বিশাল এই মসজিদে ৩০ হাজার মুসল্লী একত্রে জামায়াতে নামায আদায় করতে পারে। জামে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২ লক্ষের কাছাকছি। গেটে রয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং মেহমানদের বসার সুন্দর আয়োজন। এখানে রাস্তার পশ্চিম পাশে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও মসজিদ এবং পূর্ব পাশে রয়েছে একটি সুন্দর মাযার।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, এখানে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মাথা মোবারক দাফন করা হয়েছে। ইরাকের কারবালা প্রান্তরের বেদনা বিধুর ঘটনা প্রত্যেক মুসলমানেরই কমবেশী জানা রয়েছে। তাঁকে শহীদ করার পর তাঁর পবিত্র মাথা মোবারক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা কুফায় প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে মাথা মোবারক সিরিয়ায় দামেস্কে ইয়াজিদের কাছে পাঠানো হলে সেখানের উমাইয়া মসজিদের মাঠে দাফন করা হয়। পরবর্তীতে দাফনকৃত মাথা

মোবারক উঠিয়ে আস্কালানে নিয়ে দাফন করা হয়। ৫৪৮ হিজরীতে ক্রুসেডে যুদ্ধের সময় পবিত্র মাথা মোবারকের মর্যাদাহানী হতে পারে, এ আশঙ্কায় সেখান থেকে উঠিয়ে মিসরের কায়রো নগরীতে দাফন করা হয়। একে কেন্দ্র করে বিশাল এক মাযার ও সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই মাযারে প্রতি দিন অসংখ্য মানুষ ভীড় করে থাকে। মাযারের পশ্চিম পাশে একটি কক্ষে সংরক্ষিত রয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দাড়ি মোবারকের কয়েক গুচ্ছ, তাঁর ব্যবহৃত উটের জ্বীন ও মিস্ওয়াক। এই কক্ষটি বিশেষ সময় খুলে দেয়া হয়।

আল আইনী মাদ্রাসায়

জামে আল আযহার দেখে আমরা চলে এলাম আল আইনী মাদ্রাসা দেখার জন্য। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদের পিছনেই রয়েছে একটি গলি পথ। এই পথের ধারেই রয়েছে ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রাহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা ও মসজিদ। এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত। এই মাদ্রাসা তিনি ৮৪২ হিজরী সনে প্রতিষ্ঠা করেন। এটিও একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ইমাম বদরুদ্দীন আইনী (রাহঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসের কিতাব বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'উমদাতুল কারী' রচনা করেন। আল আইনী মাদ্রাসার পাশেই রয়েছে ইবনে হাজার আসকালানী (রাহঃ)-এর মাযার। তাঁর পূর্ণ নাম শিহাবুদ্দিন আবুল ফযল আহ্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসকালানী। তিনি শুধু হাদীসের হাফেজই ছিলেন না, অষ্টম শতকে হাদীসের হাফেজদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। এই শতকে তাঁর সমকক্ষ মুহাদ্দিস আর কেউ ছিলো না। তিনি ৮৫২ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন, হাদীস সংগ্রহের জন্য দেশ ভ্রমণ ও পৃথিবীতে হাদীস চর্চার প্রাধান্য সামগ্রিকভাবে তাঁর পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে যায়। তাঁর সমসাময়িক যুগে তিনি ব্যতীত আর কেউ হাদীসের হাফেজ হননি। তিনি বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এক হাজারেরও অধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হাদীস লিখিয়েছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আল আসকালানীর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফত্হুল বারী'। এটি বড় বড় দশটি খন্ডে বিভক্ত এবং এই গ্রন্থের ভূমিকা স্বতন্ত্র এক গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত। এটির নাম 'হুদা আস্ সারী', তাঁর নিজস্ব একটি হাদীস সঙ্কলনও রয়েছে। এটির নাম 'বুলুগুল মারাম মিন আদালাতুল

আহ্কাম, এই গ্রন্থটি আহ্কাম সংক্রান্ত হাদীসের এক বিশেষ সঙ্কলন। আলেম সমাজে এই গ্রন্থটিও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর রচিত অন্যান্য দুটো বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'তাহ্যিবুত্ তাহ্যিব' এবং তাদ্‌রিসুত্ তাহ্যিব'। এরপর আমরা গেলাম কায়রো নগরীর উপকণ্ঠে মাক্তাম পাহাড়ের পাদদেশে কারাফাতা-আছ্ছুগ্রা কবরস্থানের দিকে।

ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ)-এর মাযারে

কারাফাতা-আছছুগরা কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন মহান আল্লাহর সম্মানিত গোলাম ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ)। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ, তাঁকে ডাকা হতো আবু আব্দুল্লাহ্ বলে। তাঁর উপাধী ছিলো নাসেরুল হাদীস। শাফেয়ী তাঁর প্রো-পিতামহের নাম শাফে' থেকে চলে এসেছে। বংশগত দিক দিয়ে তাঁর সপ্তম পুরুষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিশে গিয়েছে। আল্লামা তাজুদ্দীন সাব্কি (রাহঃ) গবেষণায় তাঁর মাতাকে হাশেমীয়াহ্ হিসেবে সনাক্ত করেছেন। তাঁর নাম অনুসারেই এই এলাকার নামকরণ করা হয়েছে হাররাতুশ শাফেয়ী।

তাঁর পিতা ইদরীস ইবনে আব্বাস মদীনার কাছে উপশহর তাবালাহ্র বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি মদীনায় চলে এলেও সেখান থেকে তিনি শামে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত আস্কালানে স্থায়ী হন। ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) মাত্র ৭ বছর বয়সে পবিত্র কোরআনের হাফেজ হন এবং ১০ বছর বয়সে বিশাল হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তা ইমাম মালিক মুখস্থ করেন।

ইবনে হাজার আসকালানী (রাহঃ) তাওয়ালা আত্তাসীস গ্রন্থে ইমাম শাফেয়ীর নিজের বর্ণনা এভাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন– আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আমাকে বলছেন, হে বালক! তুমি কোন্ বংশের ছেলে? আমি জানালাম, আমি আপনার বংশের ছেলে। তখন আল্লাহর রাসূল আমাকে কাছে ডেকে তাঁর মুখের পবিত্র লালা আমার জিহ্বা, ঠোঁট এবং মুখে মাখিয়ে দিয়ে বললেন– যাও, আল্লাহ তা'য়ালা তোমার প্রতি কল্যাণের দরজা খুলে দিন।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, সেই বয়সে আমি স্বপ্নে দেখলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফে নামায আদায় করাচ্ছেন। নামায শেষে তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকেও কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি তাঁর পবিত্র জামা মোবারক থেকে একটি দাড়ি পাল্লা বের করে আমাকে দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে এটা দিলাম।

পরবর্তীতে আমি একজন বিখ্যাত স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীর কাছে গিয়ে স্বপ্নের বিষয় জানালে তিনি বললেন, এই পৃথিবীতে আল্লাহর রাসূল কর্তৃক প্রদর্শিত জীবন বিধানের বিকাশ এবং প্রচারে তুমি উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ইমাম হবে।

ইতিহাস কথা বলে, প্রকৃত অর্থেই ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) কালক্রমে জগদ্বিখ্যাত অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম রবী ইবনে সুলাইমান মন্তব্য করেছেন, 'ইমাম শাফেয়ী (রাহঃ) যে ভাষা ও বাগ্মীতার অধিকারী ছিলেন এবং বক্তৃতায়-কথায় ভাষার যে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন বা যেসব আরবী পরিভাষা ব্যবহার করতেন, তা বুঝার জন্যও যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন ছিলো। আরবী ভাষার পন্ডিত-বিষেশজ্ঞদেরও তাঁর বক্তৃতার ভাষা শুনে পর্যালোচনার প্রয়োজন হতো। তিনি তাঁর লেখা বা রচনার মধ্যে যদি সেই পারিভাষিক অলঙ্কারপূর্ণ উচ্চাঙ্গের বাগ্মীতা প্রয়োগ করতেন, তাহলে তা সাধারণ পাঠকদের বোধগম্য হতো না। কিন্তু তিনি তাঁর রচনাবলীর মধ্যে খুবই সহজ-সরল এবং বোধগম্য বর্ণনা রীতি ব্যবহার করেছেন, যা সাহিত্য মানে অতি উন্নত অথচ সহজে বোধগম্য এবং প্রাণবন্ত।'

'ইত্তেহাফুন নুবলা' গ্রন্থে নবাব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব মোল্লা আলী কারী (রাহঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ীর রচনা সংখ্যা ১১৩। 'তাওয়ালা আত্তাসীস' গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী ও হাফেয আস্কালানী (রাহঃ) বলেছেন, মিসরে ৪ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর গ্রন্থসমূহ প্রকাশ হয়েছিলো।' উসুলে ফিকাহ্-এর প্রথম কিতাব 'আর রিসালাহ্' তিনিই রচনা করেন। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস, ফকীহ্-আইনজ্ঞ, গবেষক ও শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম ছিলেন।

অগণিত মানুষের পথের দিশারী, জ্ঞানের আলোয় আলোকিত মহান আল্লাহর এই গোলাম যে স্থানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, মুসলিম মাত্রই অন্তরে সেই স্থানটি জিয়ারত করার বাসনা অনুভব করে। আমরা তাঁর জন্য দোয়া করে চলে গেলাম ইমম ওয়াকি' (রাহঃ)-এর মাযারের দিকে। মহান এই আলেমে দ্বীন ছিলেন ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম বোখারী (রাহঃ)-এর ওস্তাদ। তাঁর জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে মাগফিরাত কামনা করে মহান মা'বুদের আরেকজন সম্মানিত গোলামের শেষ বিশ্রাম স্থলের দিকে।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রাহঃ)-এর মাযারে এলাম, তিনি বিশ্ববিখ্যাত 'তাফসীরে জালালাইন'-এর অন্যতম লেখক এবং উ'লুমুল কোরআন'-এর বিখ্যাত কিতাব 'আল

ইত্কান' ও 'তাফসীরে আদ্ দুররুল মানসুর'-সহ অনেক বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের রচয়িতা। এসব কিতাব ব্যতীতও তিনি কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গবেষণাধর্মী অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ক্রুসেড বিজয়ী মহাবীর সালাহ্উদ্দিনের দুর্গে

এরপর আমরা পৌঁছলাম বিশ্ব বিখ্যাত ক্রুসেড বিজয়ী মহাবীর সালাউদ্দিন আইয়ুবীর দুর্গে। হোসাইনিয়া এলাকা থেকে সামান্য দূরেই এই দুর্গ। দুর্গটি যে পাহাড়ের ওপর অবস্থিত তার নাম জাবালুল মুকাত্তাম। মূলত এটি পাহাড়ের একটি এলাকা। কোনো কেনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই পাহাড়ের পাদদেশে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজ্দা দিতেন।

সালাউদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)-এর জন্মস্থান ইরাকের কুর্দিস্থানে এবং ইরাকের বর্তমান কুর্দি মুসলিমরা সালাউদ্দিম আইয়ুবীরই বংশধর। তিনিই খৃষ্টানদের কবল থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস মুক্ত করেন। সালাউদ্দিন আইয়ুবীর দুর্গ মিসরে 'কিল্লাআ'হ্ সালাউদ্দিন' বা সালাউদ্দিনের কিল্লা নামে পরিচিত। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৮৩ সনে এবং এই দুর্গের মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত সুদৃশ্য বিশাল আকৃতির একটি মসজিদ ও যাদুঘর। দুর্গ এবং এই মসজিদ দেখার জন্য প্রত্যেহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত মানুষ এখানে ভীড় জমায়। মহিলাদের মধ্যে যারা স্কার্ফ পরিহিত তাদেরকে লম্বা পোষাক 'আবা' পরিয়ে দেয়া হয়। এটি করা হয় মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে। এ ধরনের দর্শনীয় অনেক মসজিদ রয়েছে, যেখানে নামায আদায় করা হয় না বরং প্রত্যেক দর্শকদের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ মিসরীয় ১০ পাউন্ড আদায় করে থাকে।

দুর্গের মধ্যে যাদুঘরে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন যুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত রয়েছে। দুর্গের অভ্যন্তরে রয়েছে মুহাম্মাদ আলী মসজিদ, আল নাসির মসজিদ, সোলাইমান পাশা মসজিদ, আল তুরফা টাওয়ার, আল গাহ্রা প্যালেস যাদুঘর, আল মাক্তাম টাওয়ার, সামরিক যাদুঘরসহ অন্যান্য যাদুঘর। দুর্গের দেয়াল সর্বোচ্চ ১০ ফুট প্রশস্ত এবং এর উচ্চতা ৩০ ফুট। সম্পূর্ণ দুর্গ ঘুরে দেখতে কম করে হলেও দুই দিন সময় প্রয়োজন।

সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবীর দুর্গে প্রবেশ করে আমার স্মৃতিপটে ভেসে উঠলো অতীত হয়ে যাওয়া সেই রক্তাক্ত ইতিহাস। মুসলমানদের রক্ত নিয়ে যখন খৃষ্টশক্তি হোলি খেলায় মেতে উঠেছিলো, তখন তিনিই মুসলিমদের আর্তচিৎকারে সাড়া দিয়ে

ছুটে এসেছিলেন। ইসলাম বিদ্বেষী খৃষ্টশক্তি বর্তমান পৃথিবীতে নিজেদেরকে সবথেকে বেশী সভ্য বলে দাবী করে থাকে। বিশ্বব্যাপী গনতন্ত্র, ন্যায়-নীতি, ইনসাফ ও মানবাধিকারের শ্লোগানে তারা উচ্চকণ্ঠ।

পক্ষান্তরে তাদের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমানে সংঘটিত কর্মধারা এ কথা একধিকবার প্রমাণ করেছে যে, তারা ও তাদের দোসর জড়বাদী পৌত্তলিক সম্প্রদায় ও অভিশপ্ত ইয়াহূদী গোষ্ঠীর ঘৃণ্য পদতলেই ন্যায়-নীতি, ইনসাফ, গনতন্ত্র ও মানবাধিকার বার বার পৃষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা তাদের দ্বারাই সর্বাধিক সংঘটিত হয়েছে। জড়বাদী ভারতে সংখ্যা লঘু মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে পৌত্তলিক হিন্দুদের নিন্দনীয় আচরণ, মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহূদীদের নির্মম অত্যাচার এবং পৃথিবীব্যাপী খৃষ্টশক্তি সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নির্লজ্জ নীতি এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, অমুসলিম শক্তিই সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে শাণিত কৃপাণ হাতে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন যজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছে।

১০৯৯ সালে জেরুজালেম দখল করলো খৃষ্টশক্তি। জেরুজালেমের অধিবাসী ৭০ হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধদের একজনকেও তারা জীবিত রাখেনি। মাত্র কয়েক ঘন্টার তান্ডবে জেরুজালেম নগরী খৃষ্টানদের পৈশাচিকতায় মুসলিম শূন্য হয়ে গেলো। সাম্প্রদায়িকতার দুষ্টক্ষতে খৃষ্টানরা এমনভাবে আক্রান্ত ছিলো যে, আল্লাহ্ শব্দ উচ্চারণ করার মতো একজন মানুষকেও তারা জেরুজালেমে জীবিত রাখেনি। শুধু তাই নয়– মুসলমানদের হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয় না, মুসলমানকে হত্যা করা এবং লাশ নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করা তারা মহাপূণ্যের কাজ বলে মনে করে। বর্তমান পৃথিবীতেও এ ধরনের ছবি প্রিন্টিং ও ইলোক্ট্রনিক মিডিয়ায় একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে যে, নির্মম নির্যাতনে মুসলমানকে হত্যা করে সে লাশের ওপর পা রেখে তারা উল্লাসভরে ছবি উঠাচ্ছে।

মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেলো। ১১৮৭ সালে মুসলমানরা জেরুযালেম পুনরুদ্ধার করলো। ইতিহাস সাক্ষী, একজন খৃষ্টানের শরীরেও মুসলিমরা হাত তোলেনি এবং তাদের কোনো ক্ষতি হতে দেয়নি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আল কোরআনের অনুসারী মুসলিমরা। ৮৭ বছর পূর্বেই এই খৃষ্টানরা জেরুযালেম দখল করে অত্যন্ত লোমহর্ষক পন্থায় ৭০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছিলো, কিন্তু মুসলমানরা যখন জেরুযালেম

পুনরুদ্ধার করলো, তখন তাঁরা সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে খৃষ্টানদের প্রতিষ্ঠা করলো। এরপরেও অমুসলিমরা নিজেদের ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক চেহারা আড়াল করার লক্ষ্যে ইসলামের অনুসারী পরমত সহিষ্ণু মুসলিমদেরকে সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসী হিসেবে প্রচার করছে। অমুসলিম শক্তি মুসলমানদের উদারতাকে দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করে একের পর এক মুসলিমদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছে এবং খেলছে।

তথাকথিত ক্রুসেডের ৯০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। তৃতীয় ক্রুসেডারদের নব্য বাহিনী ইউরোপ থেকে আগমন করে ফিলিস্তিনে অবস্থানরত ক্রুসেডারদের শক্তি বৃদ্ধি করলো। অপরদিকে সিংহবীর সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)-ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শতধা বিভক্ত মুসলিম শক্তিকে শিশাঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ১১৮২ ও ১১৮৩ সনে মিসরসহ সমগ্র এশিয়া মাইনর এবং তুর্কী এলাকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুলতান সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবীর পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। সে সময় পর্যন্তও সমগ্র ফিলিস্তিন এলাকা খৃষ্টশক্তির করতলগত। খৃষ্টানদের কারাগারে অগণিত মুসলিম বন্দী অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করছে। ৮৪ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো– মুসলিমদের প্রথম কেব্লা বায়তুল মুকাদ্দাসের সুউচ্চ মিনার থেকে তাওহীদের বিপ্লবী ধ্বনী মুয়ায্যিনের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়নি।

জেরুযালেমের ওমর মসজিদে সিজ্দার পবিত্র স্থানসমূহে খৃষ্টানরা মুসলমানদের রক্তের প্লাবন প্রবাহিত করেছিলো, লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে মসজিদের অভ্যন্তরে অগণিত মুসলিমকে হত্যা করেছিলো, তখন পর্যন্তও মুসলিমদের রক্তের লোহিত আলপনা মুছে যায়নি। খৃষ্টশক্তি মুসলিম বাণিজ্য বহর আক্রমণ করে লুটপাট করছে এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের নির্মমভাবে হত্যা করছে। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি বার বার মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে।

১০৯৯ সালে খৃষ্টশক্তি জেরুযালেম দখল করে পাদ্রী গডফ্রের নির্দেশে হিংস্র হায়েনার মতোই অগণিত শান্তি প্রিয় মুসলমানদের হত্যা করেছিলো, ১১৮৬ সালে খৃষ্টান অধিনায়ক রেজিনাল্ড এন্টিয়ক নগরী দখল করে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটালো– মুসলমানদের রক্তে এন্টিয়ক নগরীর পায়ে চলা পথসমূহ পিচ্ছিল হয়ে উঠলো।

তাওহীদের বিপ্লবী সিপাহ্সালার সালাহ্উদ্দিন পবিত্র জেরুযালেম ও মুসলিম বন্দীদের উদ্ধারের লক্ষ্যে অধির হয়ে উঠেছেন। মুসলমানদের ওপর খৃষ্টানদের নির্মম

অত্যাচার দেখে তিনি নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। ৯০ বছরের পুরনো খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

এরপর ১১৮৭ সনের মার্চ মাসে তিনি আশ্‌তারা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্য ফিলিস্তিনের সীমান্ত শহর তাইবেরিয়াস দখল করা। তাইবেরিয়াসের রাজা গেডিলুসিগানের নেতৃত্বে জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে, রিমন্ড, বিলিয়ান প্রমুখ কাপালিক ক্রুসেড অধিনায়কদের অধীনে ১২ শত খৃষ্টান নাইটসহ প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য সমবিভ্যহারে তাইবেরিয়াস অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সিন্ডিনের দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ফিলিস্তিনের লুবিয়া নামক গ্রামের সন্নিকটবর্তী রণপ্রান্তরে তাওহীদের সৈন্যবাহিনী বাতিলশক্তি খৃষ্টবাহিনীর মুখোমুখী দন্ডায়মান হলো। রক্তক্ষয়ী প্রচন্ড যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর দাপটের মুখে বিশাল খৃষ্টবাহিনী তৃণখন্ডের মতোই ভেসে গেলো এবং শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করতে বাধ্য হলো। খৃষ্টানদের জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে প্রমুখ অধিনায়কসহ স্বয়ং রাজা ও তার ভাই সুলতান সালাহ্উদ্দিনের হাতে বন্দী হলেন এবং এই যুদ্ধে ৩০ হাজার খৃষ্টান সৈন্য নিহত হয়েছিলো।

যুদ্ধে বিজয়ী সালাহ্উদ্দিন তাইবেরিয়াস নগরীতে প্রবেশ করলেন। ধীর স্থির শান্ত পদক্ষেপে তিনি নগর পরিদর্শন করছেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় নেই কোনো প্রতিহিংসার চিহ্ন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে খৃষ্টানরা জেরুযালেম ও এন্টিয়ক নগরী দখল করে আত্মসমর্পণকারী হাজার হাজার মুসলিম নরনারী ও শিশুকে যে নির্মমভাবে আগুনে জ্বালিয়ে, অস্ত্রের আঘাতে, পানিতে ডুবিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিলো, সে স্মৃতি হৃদয়পটে ভেসে উঠে সালাহ্উদ্দিনের দৃষ্টিকে শুধু অশ্রুসজলই করেছিলো, হৃদয়-মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দেয়নি। অপরদিকে সাম্প্রদায়িক খৃষ্টশক্তি মিথ্যা অজুহাতে প্রতিশোধের উন্মাদনায় মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ২০০১ সনের সেপ্টেম্বার মাসের ১১ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপরে হামলা করে তার দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হলো মুসলমানদের ওপরে।

এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পৃথিবীর ইসলামী আন্দোলনসমূহকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে আমেরিকা আফগানিস্থানে হামলা করে একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী সরকার উৎখাত করলো। ইরাক দখল করে প্রত্যেক মুহূর্তে অগণিত মুসলমানদের

রক্তের বন্যা প্রবাহিত করছে। বর্তমানে গোটা ইরাক দেশটি মুসলমানদের কবরস্থানে পরিণত হতে যাচ্ছে। সভ্য জগতের সমস্ত নিয়ম-নীতি পদদলিত করে পবিত্র রমজান মাসে এবং ঈদের দিনেও অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করছে। তাদের প্রচার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে।

এই ঘটনার পেছনেও ইয়াহূদীদের চক্রান্ত সক্রিয় রয়েছে। কারণ যেদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা হলো, সেদিন সেখানে একজন ইয়াহূদীও তাদের কর্মস্থলে যোগ দেয়নি। অথচ প্রায় চারহাজার ইয়াহূদী সেখানে চাকরী করতো। ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হলো, তা সম্পূর্ণ ভিডিও করে সমস্ত প্রচার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হলো। এ ধরনের একটি মারাত্মক ঘটনার সম্পূর্ণ দৃশ্য যারা ভিডিও করলো, তারা ঘটনার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অবহিত না থাকলে যাবতীয় দৃশ্য ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করলো কিভাবে?

অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের দ্বারা এ ঘটনা সংঘটিত হবার অসংখ্য প্রমাণ মওজুদ থাকার পরও ইয়াহূদীদের প্রতিপালক ইসলাম বিদ্বেষী খৃষ্টশক্তি সমস্ত দোষ ইসলামপন্থীদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ারের মতই নির্বিচারে গনহত্যা চালাচ্ছে এবং স্বাধীনতাকামী মুসলিম সংগঠন, সেবামূলক মুসলিম সংগঠনসহ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী দলগুলোকে সাম্প্রদায়িক, প্রতিশোধ পরায়ণ ও সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করছে। অথচ খৃষ্টানদের অতিত ইতিহাস ও বর্তমান কর্মকান্ড বার বার এ কথা প্রমাণ করেছে যে, তারাই সবথেকে বড় সন্ত্রাসী এবং সাম্প্রদায়িক।

ইতিহাস সাক্ষী, সেদিন তাইবেরিয়াস নগরীতে মুসলমানরা প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনাও করেনি, একজন খৃষ্টানের শরীরে ফুলের আঘাতও সেদিন করা হয়নি। অগণিত লুন্ঠন আর হত্যাযজ্ঞের পুরোহিত রেজিনাল্ডকেই শুধু তার পাপের ২ শত সহযোগীসহ প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিলো। আর এন্টিয়ক নগরীতে খৃষ্টানরা যেখানে শহীদ মুসলমানদের লাশ কবর থেকে তুলে মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে এন্টিয়কের রাস্তায় বন্য জংলী নৃত্য উল্লাস করে বেড়িয়েছিলো, সেখানে সুলতান সালাহ্উদ্দিন তাইবেরিয়াসের পরাজিত বন্দী খৃষ্টান রাজাকে হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে প্রাণ শীতলকারী ঠান্ডা শরবত পান করিয়েছিলেন। মানবতা কাকে বলে এবং সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতার সংজ্ঞা বাস্তবায়িত করে এই মুসলমানরাই পৃথিবীর মানব সভ্যতাকে উপহার দিয়েছে।

বর্তমানে মুসলিম নামে পরিচিত মানুষগুলোর আত্মরক্ষার অধিকারও দেয়া হচ্ছে না। বরং মুসলমানরা যেনো আত্মরক্ষার অস্ত্রও না পায়- সে ব্যবস্থা গ্রহণ করে মুসলিম হত্যাযজ্ঞের নায়কদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হচ্ছে। পৃথিবী ব্যাপী মানবাধিকারের নির্লজ্জ লংঘন ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে অমুসলিম স্বঘোষিত বিশ্বমোড়ল আন্তর্জাতিক দস্যু খৃষ্ট জগৎ। অতীতে এবং বর্তমানে বিশ্বসভ্যতা ইসলামী আন্দোলনের রক্তপিচ্ছিল পথের যাত্রীদের কাছ থেকেই মানবতা উপহার পেয়েছে আর অমুসলিমদের কাছ থেকে পেয়েছে নির্মম নিষ্ঠুরতা এবং লোমহর্ষক নির্যাতন। রণপ্রান্তরে একজন মুসলিম সৈন্যের অস্ত্রের আঘাতে খৃষ্টসম্রাট রিচার্ডের ঘোড়া ধরাশায়ী হলো। মুসলিম হত্যাযজ্ঞের অন্যতম নায়ক নরপশু রিচার্ডকে নিজ আয়ত্তে পেয়ে মুসলিম সৈন্য তার দিকে শানিত তরবারী হাতে ছুটে গেলো।

রিচার্ড– এই সেই নিষ্ঠুর রিচার্ড, যে রিচার্ড মাত্র কয়েকদিন পূর্বে 'একর' নগরীতে ৫ হাজার মুসলিম শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ ও নারীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর-লোমহর্ষক নির্যাতন করে দুনিয়া থেকে চিরদিনের মতো বিদায় করে দিয়েছিলো। এই নিষ্ঠুর-সন্ত্রাসী লোকটির বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে তারই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক 'লেনপুল' মন্তব্য করেছেন, 'নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত'। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক 'গিবন' চিহ্নিত করেছেন, 'শোণিত পিপাসু' হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কক্সবার্টের ভাষায়, 'মানব জাতির নির্মম চাবুক'।

রণপ্রান্তরে নরপশু রিচার্ডকে ধরাশায়ী দেখতে পেয়ে মুসলিম বাহিনী ঘিরে ধরলো তাকে হত্যা করার লক্ষ্যে। রিচার্ড নিজেকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করছে। মুসলিম বাহিনীও তাকে বেষ্টন করে ক্রমশ বৃত্ত ছোট করে আনছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই নরপশুর জীবন প্রদীপ মুসলিম সৈন্যদের হাতে নির্বাপিত হতো। এমন সময় মহানুভবতার মূর্ত প্রতীক গাজী সালাহ্উদ্দিনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো নিষ্ঠুর লোকটির অসহায়ত্বের দিকে। দূর থেকে তিনি খৃষ্ট নরপশুর অসহায়ত্ব ও আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে ব্যথিত হলেন। শোণিত পিপাসু কাপালিক রিচার্ডের পাশব আচরণের স্মৃতি তাঁর হৃদয়পটে ভেসে উঠলো। তবুও লোকটির বীরত্বের কথা স্মরণ করে মহামতি সালাহ্উদ্দিন তাঁর প্রতি সদয় না হয়ে পারলেন না। অথচ তরবারীর সামান্য আঁচড়েই তিনি রিচার্ডকে মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে প্রেরণ করতে পারতেন। কিন্তু বিপদাপন্ন শত্রুর ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ তাঁর রুচির বিপরীত।

যুদ্ধের ময়দানে সেদিন যুদ্ধের বাহন ঘোড়ার মারাত্মক সঙ্কট ছিলো। তবুও সুলতান সালাহ্উদ্দিন আরবীয় তেজস্বী দুটো ঘোড়া রিচার্ডের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মানবতার ইতিহাস ম্লান করে দিলেন সালাহ্উদ্দিন– মুসলিম এভাবেই ইতিহাসের প্রত্যেক বাঁকে মানবতাই শুধু প্রদর্শন করেছে, মুসলমানদের সেই নির্মল-নিষ্কলুষ মানবতাকে নিষ্ঠুর পায়ে বার বার পদদলিত করেছে ইয়াহূদী, খৃষ্টান আর পৌত্তলিকরা। রিচার্ডের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। সালাহ্উদ্দিনের উপহার আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করে সেই উপহারকেই মুসলিম হত্যার মাধ্যম বানালো নরপশু রিচার্ড। নরঘাতক রিচার্ড মুসলমানদের দেয়া ঘোড়ায় আরোহণ করে নতুন শক্তিতে অস্ত্র হাতে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এই যুদ্ধের কিছুদিন পরেই রিচার্ড রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলো। যুদ্ধ ক্লান্ত পরাজিত খৃষ্টবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য তাকে পরিত্যাগ করে স্বদেশের পথ ধরলো। শয্যাশায়ী রুগ্ন রিচার্ডকে সুলতান সালাহ্উদ্দিন ইচ্ছে করলে যে কোনো মুহূর্তে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি করলেন এর বিপরীত কাজ, গোপনে তিনি রিচার্ডের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এবং লোকটির জন্য প্রত্যেক দিন সুস্বাদু ফল ও সুশীতল পার্বত্য বরফ প্রেরন করতে থাকলেন। অবশেষে সালাহ্উদ্দিনের উদারতার কাছে রিচার্ডের পশুসুলভ মানসিকতা পরাজিত হতে বাধ্য হলো। লোকটি নিজেই সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম শিবিরে আগমন করলো।

অথচ খৃষ্টানদের সাম্প্রদায়িক ও প্রতিশোধ পরায়ণ যুদ্ধবাজ সমরনায়করা মহামতি সুলতান সালাহ্উদ্দিনকে 'ত্রাস' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু সাধারণ খৃষ্টানদের কাছে তিনি Salah Uddin the great নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ইসলামের গৌরবময় স্বর্ণ উজ্জ্বল ইতিহাসের এক মহান নায়ক। তাঁর জীবনের স্বর্ণালী যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলো বাতিল শক্তির মোকাবেলায় সমরাঙ্গণেই অতিবাহিত হয়েছে। জেরুযালেম মুসলমানদের হস্তগত হবার ফলে খৃষ্ট ইউরোপ বন্য হায়েনার মতোই মুসলিম নিধনে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, ডেনমার্ক, ইতালীসহ খৃষ্ট দুনিয়া ১১৮৯ সনে ৬ লক্ষ সৈন্যসহ হন্যে কুকুরের মতো ছুটে এসেছিলো ফিলিস্তিনে। তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিলো সারা ইউরোপবাসীর উপার্জনের এক দশমাংশ।

দীর্ঘ ৩ বছর যাবৎ সালাহ্উদ্দিন হিংস্র ক্রুসেডারদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে খৃষ্টান জগতকে অপমানজনক পরাজয়বরণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর ঈমানী শক্তির

সম্মুখে বাতিলশক্তি খৃষ্টজগতের সম্মিলিত বাহিনী রণাঙ্গন থেকে তৃণখন্ডের মতোই উড়ে গিয়েছিলো। প্রায় ৫ লক্ষ খৃষ্টসৈন্যকে ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিতে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করে ইউরোপীয় ক্রুসেডার দানবরা তল্পী-তল্পা গুটিয়ে লাঞ্ছিতাবস্থায় মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো। ফিলিস্তিনসহ সারা প্রাচ্যের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে থাকলেন সিপাহ্সালার সালাহ্উদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)। খৃষ্ট জগতে তিনি যে কি ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইউরোপের ইতিহাসে। যুদ্ধ তহবিল গঠন করার জন্য ইউরোপে গঠিত হয়েছিলো Tax of Salahuddin.

১১৯৩ সন। হজ্ব সমাপন করে আল্লাহর বান্দারা দেশে ফিরছেন। মহান সালাহ্উদ্দিন গেলেন বায়তুল্লাহ্ প্রত্যাগত লোকদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে। হঠাৎ তাঁর সারা দেহে ঠান্ডা অনুভূত হলো। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। সে শয্যাই পরিণত হলো তাঁর অন্তিম শয্যায়। ১১৯৩ সনের মার্চ মাসের ৪ তারিখে সারা মুসলিম জাহানকে বিষাদ সিন্ধুতে নিমজ্জিত করে এই নশ্বর ধরাধাম থেকে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। যিনি ছিলেন তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী, আল্লাহ বিরোধী বাতিল শক্তির আতঙ্ক, পবিত্র কোরআনের বিপ্লবী সিপাহ্সালার, মুসলিম দুনিয়ার দরদী বন্ধু, আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর– সেই মহান সালাহ্উদ্দিন আর নেই। মুসলমানদেরকে ইয়াতিম করে মৃত্যু যবনিকার ওপারে তিনি চলে গেলেন।

নিপিড়ীত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, অবহেলিত, পদদলিত ও মানবিক অধিকার বঞ্চিত মুসলমানদের করুণ আর্তনাদে সাড়া দেবার আর কেউ নেই। বর্তমান পৃথিবীতে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে আর্তমানবতার ক্রন্দনরোল ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। নিষ্পেষিত মানবতার করুণ কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়, 'হে আমাদের রব্! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নাও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী এবং তোমার নিজের পক্ষ থেকে আমাদের কোনো বন্ধু-দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও!' (সূরা নিসা-৭৫)

সালাহ্উদ্দিনের মতো মুসলমানদের বন্ধু এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কখন প্রেরণ করবেন– তিনিই তা ভালো জানেন। তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের শূন্যস্থান দুর্ভাগা মুসলিম উম্মাহ্ এখন পর্যন্তও পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। দ্বীনে হক-এর আন্দোলনে আত্মোৎসর্গিত এই মহামানব যখন তাঁর শেষ বিশ্রাম স্থলের দিকে যাত্রা করেন, তখন তিনি কপর্দকহীন। বাতিলশক্তি খৃষ্টজগতের কাছে তিনি

'আতঙ্ক' হিসেবে বিবেচিত হলেও এই মহান সম্রাটের কোনো সিংহাসন ছিলো না। ছিলো না প্রাচুর্যতায় পরিপূর্ণ বিলাস-বহুল অট্টালিকা বা রাজপ্রাসাদ। তাঁর কাছে দেশের বিশাল অর্থ ভান্ডার গচ্ছিত ছিলো, কিন্তু একান্ত নিজের বলতে কিছুই ছিলো না। তিনি নিজের জীবন-যৌবন ও অর্থ-সম্পদ সবকিছুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জিহাদের পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ইচ্ছে করলে তিনি বিপুল শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করে নিজেকে বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিলাসী জীবন-যাপন করতে পারতেন। কিন্তু সে পথে তিনি পা বাড়াননি। তিনি বেছে নিয়েছিলেন জিহাদের কঠিন-বন্ধুর পথ। পৃথিবীব্যাপী ইসলামের বিজয় কেতন উড়ছে– এই দৃশ্য দেখার জন্য তিনি ছিলেন উদগ্রীব। আর এ লক্ষ্যেই তিনি তাঁর শেষ শক্তিটুকুও ব্যয় করেছেন। মহান আল্লাহর দুশমনদের মোকাবেলা করার জন্য তিনি সাগর-নদী, পাহাড়-পর্বত ও প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন। যেদিন এই মহান ব্যক্তিত্ব পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন, সেদিন জানাযার সামান্য খরচের অর্থও তাঁর ব্যক্তিগত তহবিলে পাওয়া যায়নি। অন্যের কাছ থেকে অর্থ ঋণ করে তাওহীদের এই মহান সিপাহ্সালারের জানাযা আদায় করা হয়েছিলো।

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে– সমরাঙ্গনের কঠিন সময়েও তাওহীদের আলোয় আলোকিত তাঁর হৃদয় থাকতো মোমের মতোই কোমল। যুদ্ধের ময়দানে একজন খৃষ্টান নারী করুণ কণ্ঠে আর্তচিৎকার করতে করতে সুলতান সালাহ্উদ্দিনের তাঁবুর দিকে ধাবিত হলো। প্রহরী সে নারীকে তাঁবুর প্রবেশ পথেই থামিয়ে দিলো। খৃষ্টান নারী প্রহরীদের প্রতি করুণ কণ্ঠে আবেদন জানালো, তাকে যেনো সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয়। প্রহরী সে নারীকে সালাহ্উদ্দিনের সম্মুখে নিয়ে গেলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে থাকলো, 'মুসলিম সৈন্যরা আমার শিশু সন্তানকে গ্রেফতার করেছে, আপনি অনুগ্রহ করে আমার কলিজার টুকরাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দিন!'

সন্তানহারা মায়ের করুণ আর্তনাদ সুলতান সালাহ্উদ্দিনের চোখ দুটো অশ্রুসজল করে তুললো। তিনি সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যদের শিবিরগুলোয় অনুসন্ধান চালানোর আদেশ দিলেন এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের বুকে ফিরিয়ে দিলেন। সন্তান বিরহিনী মায়ের কোলে সন্তানকে ফিরিয়ে দিয়ে মুসলিম সিপাহ্সালার সালাহ্উদ্দিন যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, খৃষ্টজগৎ মুসলমানদের সে মহানুভবতাকে নির্মম পায়ে পিষ্ট করে মুসলিম শিশু-কিশোরদেরকে পাথর ও

বেয়নোটের আঘাতে, শ্বাসরোধ ও আগুনে পুড়িয়ে এবং পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করছে। গর্ভবতী মুসলিম মায়ের পেট চিরে সন্তান বের করে সে সন্তানকেও পাথরের ওপর নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। পেট কাটা মুসলিম মায়ের শরীর যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে দিতে এক সময় নিথর হয়ে যাচ্ছে। আর এই লোমহর্ষক দৃশ্য উপভোগ করে হিংস্র হায়েনা ইয়াহূদী-খৃষ্ট ক্রুসেডাররা অট্টহাসি হাসছে।

আশ্চর্যজনক স্থাপনা পিরামিড

সালাউদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)-এর কেল্লা পরিদর্শন শেষে আমরা রওয়ানা দিলাম পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম পিরামিড দেখার উদ্দেশ্যে। একেবারে কাছ থেকে পিরামিড দেখার অনুভূতিই আলাদা। বিশাল মরুভূমিতে পিরামিড ত্রয় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের গ্রন্থিত অনেক ইতিহাস ও মহাকালের সাক্ষী হয়ে। পিরামিডের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার মানসপটে ভেসে উঠলো সেই সুদূর অতীতে কিশোর বয়সে একটি বইতে পড়েছিলাম পিরামিড সম্পর্কে। দীর্ঘ কয়েক যুগের ব্যবধানে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আজ বয়সের এক প্রান্তে এনে আমাকে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম সেই পিরামিডের সম্মুখে দাঁড় করিয়েছেন।

মিসরে ছোট-বড় অনেক পিরামিড রয়েছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদগণ যুগের পরে যুগ ব্যাপী গবেষণার মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, এসব পিরামিড ফারাওদের সমাধী। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব যুগে মিসরে যেসব শাসক ছিলেন, পিরামিড হলো সেসব শাসকদের কবর। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাদের মতামতের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও পেশ করেছেন। কিন্তু পিরামিডসমূহের দেয়ালে সাংকেতিক শব্দে যেসব কথা লেখা রয়েছে, তার সবগুলোর মর্ম বর্তমান সময় পর্যন্তও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে যেগুলোর মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে গবেষকদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এসব পিরামিড ফিরআউন উপাধিধারী শাসক ও তাদের নিকটাত্মীয়দেরই সমাধী সৌধ।

পিরামিড কি?

প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষকগণ বলেন, সেই প্রাচীনকালে মিসরের ফেরো (ফিরআউন) রাজাদের প্রথা অনুসারে একজন ফেরোর সিংহাসনে আরোহণের পরই প্রথম কাজ ছিলো নিজের ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের শেষ বিশ্রামস্থল ও মরণোত্তর আনুসঙ্গিক দিকগুলো প্রস্তুত করা। এই লক্ষ্যেই তারা শাসনদন্ড লাভ করার পরপরই সর্বপ্রথমে পিরামিড নির্মাণের কাজে হাত দিতেন। শুধু পিরামিড নির্মাণই নয়- তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে যা কিছু করা প্রয়োজন, তা পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রস্তুত করা হতো। নানা রঙে পিরামিডের দেয়াল, প্রবেশ পথ, ওপরের দিক, শবাধার, তৈজষ ও নানা আসবাপত্র, বিস্তৃত শিলা রঙিন করা হতো। মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান পাথর, মণি-মুক্তা ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিস পত্র দিয়ে পিরামিডের অভ্যন্তর ভাগ পরিপূর্ণ করা হতো। ঠিক এ কারণেই এমন কোনো পিরামিড বা এ ধরনের সমাধী নেই, যেখানে মানুষের হাতের স্পর্শ ঘটেনি। ফিরআউন ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের এমন কোনো কবর সৌধের মধ্যে যে অতুল ঐশ্বর্য রক্ষিত থাকতো তার প্রতি বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যের লুণ্ঠনকারীদের মতো সেই প্রাচীন যুগের লুণ্ঠনকারীরাও প্রলুব্ধ ছিলো।

সুউচ্চ পিরামিড, বিভ্রান্তিকর প্রবেশদ্বার ও গোপন সমাধিগৃহ নির্মাণ সত্ত্বেও সমাহিত হবার পরেই ফিরআউন ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কবরে চোর বা লুণ্ঠনকারীদের হাত পড়েছে। মিসরে পশ্চিম থীবস্-এর প্রাচীন রাজাদের সামিধ উপত্যকায় চোর বা লুণ্ঠনকারীদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যেখানে তারা প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি, সেখানে ১৯২৩ সালে প্রচুর স্বর্ণাভরণ, মণি-মুক্তা ও অন্যান্য মহার্ঘ জিনিসপত্রসহ সম্পূর্ণ অক্ষত একটি মমি আবিষ্কৃত হওয়ায় সে সময়ে দুনিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

অষ্টাদশ রাজবংশের দ্বাদশ রাজা ফিরআউন টুতেনখানেম-এর এই সমাধি ও মমির বিস্তৃত ছবিসহ নানা ধরনের বিবরণ প্রত্যেক দেশের সংবাদ মাধ্যম ও পত্র-পত্রিকার শিরোণামে প্রকাশ পায়। এ কারণে মিসরের প্রাচীন নিদর্শন সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষকদের মধ্যে নতুন করে জোয়ার সৃষ্টি হয়। টুতেনখানেম-এর এই সমাধি সৌধ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই প্রায় ১০ বছর সময় প্রয়োজন হয় এবং পরিষ্কার পরই তা উন্মুক্ত করা হয়। এটির আবিষ্কারক ছিলেন লর্ড কারনাভন ও হোয়ার্ড কার্টার এবং তাদের সহকারী ছিলেন অনেকেই। এদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে টুতেনখানেম

এর সমাধি সৌধ থেকে উদ্ধার করা হয় নানা ধরনের আসবাবপত্র, অস্ত্র, মণি-মুক্তা, মৃতের উদ্দেশ্যে দেয়া নানা ধরনের জিনিসপত্র ও ব্যবহার করার জন্য বাক্স। এসবই কায়রো মিউজিয়ামসহ পৃথিবীর অন্যান্য মিউজিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

পিরামিড শব্দের অর্থ নিয়ে মতভেদ

ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ বলেছেন, পিরামিড প্রাচীন মিসরীয় শব্দ 'মের'। ইংরেজী শব্দ পিরামিড এসেছে গ্রীক শব্দ 'পিরামিস' থেকে। গ্রীক শব্দ পিরামিস-এর অর্থ হলো 'গমের পিঠা'। এই গমের পিঠার সাথে মিসরের স্মৃতিস্তম্ভগুলোর আকৃতিতে বিশেষ এক সাদৃশ্য দেখে প্রাচীন গ্রীকরা হয়তো এমন নামকরণ করে থাকবে। ঐতিহাসিক ও গবেষক ওয়ালিস বাজ্-এর মতানুসারে এই শব্দের উৎপত্তি কোত্থেকে ও কিভাবে হয়েছে, তা বর্তমান সময় পর্যন্তও নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, এটি আর্য শব্দও হতে পারে। গ্রীক ভাষায় এই শব্দের অর্থ হলো 'আগুন'। হিন্দি অভিধান অনুসারে পিরামিড শব্দের অর্থ হলো স্তুপ।

কিন্তু ঐতিহাসিক ওয়ালিস বাজসহ অনেকেই বলেছেন, যারা পিরামিড শব্দের অর্থ বলছেন আগুন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। অধ্যাপক আইসেনলোহর বলেছেন, 'পিরামিড' শব্দটি মিসরীয় শব্দ 'পের-এম-আস' শব্দ থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ হলো উচ্চতা বা উচ্চ থেকে উদ্ভূত। গবেষক বাজসহ অনেকে বলেছেন, অন্য গ্রহণযোগ্য বুৎপত্তি না পাওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক আইসেনলোহর-এর মতই গ্রহণ করতে হবে। তবে পিরামিড গাত্রে যেসব কথা উৎকির্ণ করা রয়েছে যেগুলোর মর্ম বর্তমান সময় পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে অমুসলিম গবেষকগণও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, প্রাচীন মিসরীয়দের মধ্যে অনেকে তাওহীদে বিশ্বাসী ও মৃত্যুর পরের জীবনে অর্থাৎ আখিরাতে বিশ্বাসী ছিলো।

অর্থাৎ তারা একমাত্র স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলো এবং পৃথিবীর জীবনই শেষ জীবন নয়– মৃত্যুর পরেও অনন্তকালের জীবন রয়েছে এ কথা খৃষ্টপূর্ব ৫০০০ হাজার বছর পূর্বের লোকজনও বিশ্বাস করতো। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাওহীদই ছিলো মূল ভিত্তি এবং মৃত্যুর পরে পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব মহান স্রষ্টার সম্মুখে দিতে হবে এ কথা তারা বিশ্বাস করতো এবং সে অনুসারেই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করার চেষ্টা করতো। পক্ষান্তরে গবেষকদের সিংহ ভাগই অমুসলিম হবার কারণে অন্যান্য তত্ত্ব যেভাবে প্রচার মাধ্যমে এবং লেখনীর মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, সেভাবে প্রাচীন মিসরীয়দের তাওহীদ ও পরকাল ভিত্তিক জীবন-যাপনের বিষয়টি প্রচার করা হয়নি।

পিরামিড নির্মাণের কৌশল

মিসরে প্রাচীনকালে সকল পিরামিড নির্মাণে একই কৌশল বা একই ধরনের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা হয়নি। কোনোটি নির্মাণ করা হয়েছে রোদে শুকানো ইট দিয়ে, কোনোটি পাহাড় কেটে আবার কোনোটি বিশাল আকৃতির পাথরের চাঁই ব্যবহার করে। যেমন পৃথিবী বিখ্যাত সাক্কারা পিরামিড, গবেষকদের ধারণা অনুসারে প্রাচীন মিসরের রাজা জোসের নিজের সমাধি সৌধ হিসেবে এই পিরামিড নির্মাণ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও গবেষক মিনুটোলি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মেমফিসের পশ্চিম মরুভূমির সমাধি সৌধ উৎখনন করে সাক্কারা মালভূমিতে পৃথিবী বিখ্যাত সাক্কারা পিরামিড আবিষ্কার করেন।

গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ বলেন, সিঁড়ির আকৃতির এই পিরামিড পৃথিবীর সবথেকে প্রাচীন পাথরে নির্মিত স্থাপনা এবং পৃথিবীর সর্বকালের বৃহত্তম আদি সৌধগুলোর অন্যতম। এই সাক্কারা পিরামিডের চতুর্দিকে ছিলো উঁচু প্রাচীর ঘেরা অট্টালিকার সারি, অন্তেষ্টিক্রিয়ার স্থান, উপসানালয়, একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ ও নানা ধরনের ছোট-বড় স্থাপনা। কালের প্রবাহে এসব স্থাপনা মরুভূমির মাটি ও বালুর নীচে চাপা পড়েছিলো। আবিষ্কৃত হবার পরও প্রত্নতাত্ত্বিক দলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ১০/১২ বছর পরে এসব দর্শনীয় স্থাপনা সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আওতায় আসে।

বিশাল এই পিরামিডের মাটির নীচের অংশ ৭৭ ফুট গভীর এবং ২৪ ফুট গ্রানাইট পাথরের চাঁইয়ে বাঁধানো একটি ঢালু সরু গলিপথ ও যাতায়াতের সিঁড়ি। এই বাঁধানো স্থানের ওপরে রয়েছে দুটো কক্ষ এবং দেয়ালগুলো সবুজ ও নীল রঙের টালি দিয়ে মোড়ানো। এর মধ্যে ছিলো রাজার নাম ও নানা ধরনের উপাধিসহ একটি সংযোগকারী দরজা। কক্ষগুলোর উপরিভাগ গাঁথুনিতে গাঁথা এবং একটি আয়তাকার মূল্যবান বিশাল পাথরের চাঁইয়ের ১৯২ ফুট উঁচু, ২২৭ ফুট চওড়া ও ৪০০ ফুট লম্বা এই অতিকায় সমাধি সৌধ।

কক্ষগুলো, সিঁড়ি পথ ও সুড়ঙ্গপথ সমতল পর্যন্ত গেঁথে তোলা হয়েছে। এর ওপর প্রায় ৪০ ফুট উঁচু এবং ৪০০ ফুট প্রশস্ত চুনা পাথরের চাঁইয়ের এক বিশাল চতুর্ভুজ নির্মাণ করা হয়েছে। এর ওপর আবার একটি অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বিতীয় সৌধ, তার ওপরে তৃতীয়, তার ওপর পঞ্চম এবং তার ওপর ষষ্ঠ চতুর্ভুজ নির্মাণ করা হয়েছে। এর প্রত্যেক নীচেরটি থেকে ছোট যেমন– প্রথমটি ৩৮ ফুট, দ্বিতীয়টি ৩৬ ফুট,

তৃতীয়টি সাড়ে ৩৪ ফুট, চতুর্থটি ৩২ ফুট, পঞ্চমটি ৩১ ফুট এবং ষষ্ঠটি সাড়ে ২৯ ফুট উঁচু। প্রত্যেকটি সিঁড়ি প্রস্থ থেকে ৭ ফুট নীচে, প্রান্তগুলোর দৈর্ঘ উত্তর ও দক্ষিণে ৩৫২ ফুট এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ৩৯৬ ফুট।

এই সাক্কারা পিরামিডের প্রকৃত উচ্চতা ১৯৭ ফুট এবং এটি আকৃতিতে আয়তাকার। এর পার্শ্বগুলো প্রধান বিন্দুসমূহ স্পর্শ করেনি এবং এর ভিতরের প্রকোষ্ঠের গঠন বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও দর্শনীয়। এই পিরামিডের ভগ্নাবশেষ থেকে বোঝা যায় এটি খুবই উচ্চাঙ্গের শিল্পশৈলী ও সর্বোত্তম নৈপুণ্যের নিদর্শন। গবেষকদের ধারণা অনুসারে এটি নির্মিত হয় প্রায় ৫ হাজার বছর পূর্বে এবং এটি এখন পর্যন্তও অক্ষতই রয়েছে। সিঁড়ি পিরামিড নামে খ্যাত এই পিরামিড পৃথিবীর এক অপার বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই পিরামিডে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কোনো মমি খুঁজে পাননি। যে জোসের নামক রাজা এই পিরামিড নির্মাণ করিয়েছেন, তিনি তার কবরের জন্য মিসরে বেট-খালাপ নামক স্থানে আরেকটি পিরামিড নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং এখানেই তার মমি পাওয়া গিয়েছে।

তিনি আরেকটি রাজকীয় কবর সৌধ নির্মাণ করিয়েছেন মিসরের থিনিস নগরীর পেছনে পূর্বের রাজাদের কবরভূমি থেকে ১৪ মাইল উত্তরে বর্তমানে বেট-খালাপ নামক স্থানে। এখানে ৩০০ ফুট লম্বা ১৫০ ফুট প্রশস্ত ও ৩০ ফুট উঁচু রোদে শুকানো ইটের একটি বিশাল আকৃতির মিনার নির্মাণ করা হয়। ধারণা করা হয় এটি পাথরের পাহাড়ের ওপর নির্মাণ করা হয়েছিলো, কারণ এর নীচে ১২টি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পাথর কেটে নির্মিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫০ ফুট নীচে ছিলো একটি ঢালু ছাদযুক্ত সুড়ঙ্গ পথ। এই পথটি ওপর থেকে ফেলা কমপক্ষে ৫টি বিরাটাকারের পাথর প্রতিবন্ধক দিয়ে বন্ধ করা ছিলো। গবেষকগণ মনে করেন, এই ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে সমাধি সৌধেব সম্পদ রক্ষা করা।

গবেষকগণ বলেন, এক সময় এখানে একটি সাদা পাহাড় ছিলো। রোদে পোড়া ইটে নির্মিত চত্বরসহ উত্তম যাতায়াতের পথ নগরীর পেছনে বিস্তৃত প্রান্তর পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। এই শান বাঁধানো ইটের চত্বরে সুন্দর কাজ করা স্তম্ভ সারির ওপর উপাসনালয় নির্মাণ করা হয়েছে। এই উপাসনালয়ে ফিরআউনদের বেশ কয়েকটি প্রতিমূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। সাক্কারা বা সিঁড়ি পিরামিড ১৫ হেক্টর আয়তক্ষেত্রের ৫৪৪ x ২৭৭ মিটার স্থান জুড়ে অবস্থিত। এই সৌধের চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিলো– যা কালের আবর্তনে অনেকটাই ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। আরেকটি পিরামিড

একটি বিরাট আয়তক্ষেত্রাকার ৭৩ ফুট গভীর গর্ত মরুভূমির মালভূমিতে চুনা পাথরের খাতে অতিকায় দীঘি বা পুকুরের মতো ৮২ ফুট লম্বা ও ৪৬ ফুট চওড়া। এটি পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ ধারে একদিকে অতি সুন্দর এক গিরিপথ ২৮ ফুট চওড়া এবং ৩৬০ ফুট লম্বা। গর্তের মেঝে বিরাট আয়তাকার সাইজের গ্রানাইট পাথরের চাঁই দিয়ে ঢাকা। এর ওজন ৯ টনের অধিক। মাঝের চাঁইটি এত বিশাল যে এটির ওজন ছিলো ৪৫ টন।

কোনো কোনো ফিরআউন নিজের কবরের জন্য দুটো পিরামিড নির্মাণ করতো। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে একটি কবরে তাদের মৃতদেহ থাকতো আরেকটি কবরে তাদের আত্মা বাস করতো। গবেষকদের অনুমান, এই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করতো ফিরআউন স্নেফু। রাজা স্নেফু ইতিহাসে জগৎ বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণের জন্য পরিচিতি লাভ করেছেন। এই দুটো পিরামিড মিসরের মেম্ফিস ও ফাইউম এলাকার মধ্যে অবস্থিত। তদানীন্তন রাজধানী মেম্ফিস থেকে নীলনদ সম্মুখে রেখে ৩০ মাইল উপরে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম মরুভূমির ওয়েষ্টা নামক এক স্থানে বর্তমান মেডাম এলাকার কাছে। চুনা পাথর ও গ্রানাইট চাঁইয়ে প্রস্তুত ১৩ একর বিস্তৃত এই পিরামিডটি ১২০ ফুট উঁচু। এর তিনটি স্তর যথাক্রমে ৭০, ৩০ ও ২০ ফুট উঁচু। গবেষকদের ধারণা, এই পিরামিড নির্মাণের সময় মোকাদ্দাম পাহাড়ের খনি থেকে পাথর উত্তোলন করে নীলনদের বন্যার সময় কয়েক মাইল উত্তর থেকে ভেলায় করে আনা হয়েছিলো। এটির প্রবেশ পথ উত্তরের দিকে, প্রান্তগুলো একটি সাধারণ মধ্যবর্তীস্থানে ৭৪ ডিগ্রী কোণে ঢালু হয়ে গিয়েছে এবং ওপরে ৭ টি প্রলেপ দেয়া হয়েছে।

রাজা স্নেফুর দ্বিতীয় পিরামিডটি প্রাচীন রাজধানী মেম্ফিসের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে ডাহসুর নামক এলাকার মরুভূমির মালভূমিতে নির্মিত হয়। এটি একটি বিশাল সৌধ প্রায় বৃহৎ পিরামিডের অনুরূপ যা বর্তমান সময় পর্যন্তও ৩২০ ফুট উঁচু এবং এর নীচের প্রত্যেক দিক ৭০০ ফুট লম্বা। এর ভিতরে একটি উঁচু বাঁধানো পথ নির্মাণ করা হয় যা মাঠের কাছে মন্দিরে এসে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, তারা কবর সৌধের কাছে প্রার্থনা করার জন্য মন্দিরও নির্মাণ করতো।

ঐতিহাসিকগণ মিসরের প্রাচীন রাজাদের মধ্যে খেফু বা খুফু রাজাকে অধিক গুরুত্ব সহকারে ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন শুধুমাত্র গিজা পিরামিড নির্মাণ করার জন্য। এই পিরামিডটি বর্তমান কায়রো নগরী থেকে ১০ মাইল দূরে নীল নদের অপর পাড়ে

নির্মাণ করা হয়। এটি উচ্চ এবং নিম্ন মিসরের বিভাজন রেখার মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত। গবেষকগণ বলেন, এই স্থানটি পূর্বে সাদা চুনা পাথরের উঁচু মালভূমি ছিলো। মিসরীয় ভাষায় এই পিরামিডকে 'খুট বা ইখুট' অর্থাৎ গৌরব বা গৌরনের স্থান বলা হয়। এটি সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোনো সৌধের তুলনায় সর্বাধিক উঁচু ছিলো।

এই পিরামিডটির উচ্চতা ৪৮১ ফুট, এর প্রত্যেক পার্শ্বই ৭৫৫ ফুট পরিমাপের, ভূমিতলের আয়তন ৫৭০ বা ৯৯৬ বর্গ ফুট বা ১৩ একরের অধিক। এই ভিত্তির ওপর নিরেট পাথরের এক পর্বত তৈরী করা হয়। এর ঘন বস্তুর পরিমাণ ৮৫,০০০,০০ ঘন ফুট। ২৩,০০,০০০ পাথরের চাঁই এই পিরামিডে ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রত্যেকটির ওজন ৩ থেকে ৫ টন। গবেষকগণ বলেন, পৃথিবীতে কোনো অট্টালিকা নির্মাণে এত অধিক পাথর ব্যবহৃত হয়নি। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস লিখেছেন, এই পিরামিড নির্মাণের কাজে ১০০,০০০ লোক নিয়োজিত ছিলো এবং প্রত্যেক ৩ মাস অন্তর ঐ সংখ্যক লোক এসে পূর্বের লোকদের অব্যাহতি দিত। পাথরের চাঁইগুলো বহনের সরু রাস্তা নির্মাণের জন্য ১০ বছর সময় প্রয়োজন হয়েছিলো এবং আরো ২০ বছর অতিবাহিত হয়েছিলো মূল পিরামিড নির্মাণের জন্য। তখন পর্যন্ত চাকা আবিষ্কার হয়নি বিধায় পাথর আনার জন্য এক ধরনের স্লেজ গাড়ি ব্যবহৃত হতো– যা মানুষ টেনে নিয়ে যেতো। যে পথে এই গাড়ি টানা হতো, সেই পথে গাড়ির আগে আগে এক দল লোক পানি ছিটিয়ে পথ পিচ্ছিল করে দিতো।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, বর্তমান কায়রো নগরীর অপরদিকে অবস্থিত গিজা এলাকায় সে সময়ে সমগ্র মিসর সাম্রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য, নৈপূণ্য ও শ্রমশক্তি ব্যয়ে রাজার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার জন্য এই বিশাল এবং অপ্রবেশ্য পিরামিড নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে দুটো প্রধান প্রবেশ পথ রয়েছে এর একটি ভূগর্ভস্থ পাহাড়ের কঠিন শিলাময় স্তরের একটি কক্ষে, অন্যটি একটি হল ঘরের ঢালু পথ দিয়ে এসে গাঁথুনির মধ্যে সমাধি কক্ষে যেখানে গ্রানাইট পাথরে নির্মিত শবাধার রাখা ছিলো সেখানে মিলেছে। এই পিরামিডের দেয়ালের পাথরের চাঁইগুলো এত সুক্ষ্মভাবে গাঁথা যে একটি সুঁচের অগ্রভাগ বা চুলও সেই প্রায় অদৃশ্য জোড়াগুলোর মধ্যে প্রবেশ করানো যেতো না। সমাধি কক্ষের ওপর কতকগুলো পাথরের চাঁইয়ে রাজার নাম ও অন্যান্য বিষয় লেখা ছিলো। পিরামিডের অভ্যন্তরে যেসব গলিপথ নির্মাণ করা হয়েছে, এসব পথে প্রবেশ পথ ছিলো মাত্র একটি এবং একটি গোপন দরজা দিয়ে এটি বন্ধ করা থাকতো।

একটি মসৃণ ও পালিশ করা চুনা পাথরের চাঁইয়ের ঢাকনা দিয়ে সৌধটি সম্পূর্ণ করা হয়। দেখা যায় এই চাঁইগুলো অতি নিপুণভাবে একটির ওপর আরেকটি বসানো এবং এইভাবে নির্মাণ শেষে পিরামিডটিকে একটি সাদা উজ্জ্বল পাথরের অলীক বস্তু বলে প্রতীয়মান হতো। এটি ছিলো একেবারে খাড়া কাচের মতো মসৃণ যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে সামান্য কিছু ওপরে ওঠাও সম্ভব ছিলো না অথবা কোনো পাখিও সেখানে স্থিরভাবে বসে থাকতে পারতো না। বর্তমান যুগের অনেক গবেষকদের দৃঢ় ধারণা, এর নীচে ও ভিতরে এমন অনেক কক্ষ রয়েছে, যেখানে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ-রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু রয়েছে এবং পৃথিবী ব্যাপী যে মহাপ্লাবন হয়েছিলো, তার পূর্বেই এই পিরামিড নির্মাণ করা হয়েছে। সাক্কারা পিরামিডের দেয়ালে প্রাচীন মিসরীয়দের ধর্মবাণী, আকিদা-বিশ্বাস ও তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে নানা কথা লেখা রয়েছে।

পিরামিড গাত্রে অঙ্কিত এ কোন্ ভাষা?

মিসরের পিরামিডের দেয়ালে, ফিরআউনদের শবাধারে, পাথর খন্ডে, পাহাড় গাত্রে, মৃৎপাত্রে, প্যাপিরাস পত্রে, প্রাচীন রাজাদের ব্যবহৃত আংটি ও অন্যান্য জিনিসে, উপাসনালয়ে ইত্যাদি স্থানে অঙ্কিত যেসব বাণী আবিষ্কৃত হয়েছে, দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফলে তার মর্ম উদ্ধার করা হয়েছে বলে গবেষকগণ দাবী করে থাকেন। আধুনিককালে প্রাচীন মিসরের ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের মাধ্যমে আবিষ্কৃত ও অন্যান্য বিষয় থেকে বিপুল পরিমাণে উপাদান আবিষ্কৃত এবং মিসরতত্ত্বের ওপর প্রভূত ও ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। এর প্রধান অবলম্বন হলো প্রাচীন যুগের মিসরীয় লিপি। এই লিপির পাঠোদ্ধারের ফলেই প্রাচীন মিসরীয় ইতিহাসের লুপ্ত কাহিনী সম্পর্কে বর্তমান যুগের মানুষ আরো অধিক কিছু জানতে পেরেছে।

মিসরে প্রাচীনকালে অর্থাৎ ফিরআউনদের শাসনামলে তিন ধরনের খোদিত ও লিখিত লিপি প্রচলিত ছিলো। গবেষকগণ এসব লিপির নাম দিয়েছেন হায়েরোগ্লিফ, হায়েরেটিক ও ডেমোটিক। এ তিনের সমষ্টিগত রূপ ছিলো কপটিক ভাষা।

হায়েরোগ্লিফে উৎকীর্ণ বা খোদিত লিপির লিখন পদ্ধতিতে ছবি বা চিত্র দ্বারা প্রাচীন মিসরীয়রা মানুষ, পশুপাখী, বৃক্ষ, তরুলতা, ঘরবাড়ি, অস্ত্র, যন্ত্র ও অন্যান্য জিনিস বুঝাতো। এটিকেই গবেষকগণ হায়েরোগ্লিফ বা চিত্রলিপি ভাষা নামে অভিহিত করেছেন। প্রায় ৭০০ শতটি প্রায়ই ব্যবহৃত বর্ণ বা ছবি হায়েরোগ্লিফ ভাষায় পাওয়া

গিয়েছে। সাধারণ মিসরীয়রা এই ভাষাকে বলতো এটা স্রষ্টার ভাষা এবং মিসরে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাচীন যেসব ধর্মগ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে, তা হায়েরোগ্লিফ ভাষাতে বা চিত্রলিপির মাধ্যমেই লেখা। ৩১৪ খৃষ্টাব্দে এই ভাষার সর্বাধুনিক পাঠ্য পাওয়া গিয়েছে এবং এই ভাষা প্রস্তর ফলক, উপাসনালয়ের দেয়ালে, মৃতদেহ মমি করে মার্বেল পাথরে নির্মিত যেসব শবাধারে রাখা হতো, সেসব শবাধারের গায়ে, মৃৎপাত্রে ও পাহাড়ের গায়ে খোদিত করা হতো।

এর পরবর্তী লিখন পদ্ধতির নাম হায়েরেটিক পদ্ধতি। এটি হায়েরোগ্লিফের এক টানা বা অবিচ্ছিন্ন সংশোধিত রূপ এবং এর প্রচলন হয় ফিরআউনদের তৃতীয় ও পঞ্চম রাজবংশের রাজত্বকালে। গবেষকদের ধারণা, এটাই মানুষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি সাধারণ হস্তলিপি যা পঞ্চম রাজবংশের শাসনামলে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়। বড় ধরনের পাখি বা ময়ুরের পালক অথবা নলখাগড়ার কলমে বা আমাদের দেশে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত খাগের কলমের মতো প্যাপিরাস পত্র, মৃৎপাত্র ও প্রস্তরখন্ডে ডান থেকে বামে এই লিপি লেখা হতো। এই ভাষা প্রধানত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ব্যবহার করতো।

এরপর ডেমোটিক বা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষা। এটি হায়েরোগ্লিফের এক সরলীকৃত রূপ। এই লিখন পদ্ধতি সমান্তরালভাবে ডান দিক থেকে বামে লেখা হতো। কপটিক প্রাচীন মিসরীয় ভাষার সর্বশেষ রূপ। এর ৪ বা ৫ টি উপভাষার কথা জানা যায়। এর নামটি প্রাচীন মিসরীয় শহর কেবট– আরবী ভাষায় কুবত-এর মাধ্যমে গ্রিক কপটিক নামে রূপান্তরিত হয়। কপটিক ভাষার বর্ণমালা গ্রিক ভাষা থেকে গৃহিত এবং এর মধ্যে প্রাচীন মিসরীয় হায়েরোগ্লিফ, হায়েরোটিক ও ডেমোটিক লিপি থেকে নেয়া হয়েছে ৬ টি বর্ণ। এই কপটিক লিপির পাঠোদ্ধারের ফলেই প্রাচীন মিসরীয় উৎকীর্ণ লিপি, প্যাপিরাস পত্র ইত্যাদি পাঠ করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীকালে মিসর বিভিন্ন দেশের পদানত হবার ফলে এসব ভাষা পরিত্যক্ত হয়েছে এবং আদি আরবী ভাষাই সেখানের মাতৃভাষা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

প্রাচীন মিসর দেশের সবচেয়ে আদি ঐতিহাসিক নথি হলো একটি মূল্যবান পাথরের চাঁই। যে কোনো কৌশলেই হোক এটি ইতালীয়রা হস্তগত করে। ইতালীর উত্তর-পূর্বে সিসিলি প্রদেশ ও রাজধানী শহর পার্লেমো যাদুঘরে এই পাথরটি রয়েছে। এটি একটি অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন। এতে সে সময়ের প্রত্যেক রাজার নাম এবং তাদের

প্রত্যেক দিনের নানা ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট স্মরণে রেখে মিসরের সেই প্রাচীন ইতিহাস পড়তে হবে যে, মিসরের প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন যা কিছু বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে, তার বেশীর ভাগই হয়েছে পশ্চিমা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের হাতে। সুতরাং মিসরের সে সময়টি কোন্ নবী-রাসূলের যুগ ছিলো তা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তাদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থেও এ সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

স্ফিংক্স বা আবুল হাওল

গিজা পিরামিডের পূর্ব দিকেই রয়েছে এই স্ফিংক্স বা আবুল হাওল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই মূর্তির পূর্বনাম বেলবীব বলে উল্লেখ করেছেন, আরবেরা একে আবুল হাওল নামকরণ করেছে। এটি একটি বিরাট পাথরের মূর্তি। মূর্তিটি যে কত বড়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সম্পূর্ণ মূর্তিটি বিশাল বিশাল আকৃতির পাথরের মধ্যে খোদাই করে বসানো। মূর্তিটির গোটা দেহ সিংহের শুধুমাত্র মুখমন্ডল মেয়ে মানুষের আকৃতির। কোন্ সুদূরে এই মূর্তি যে কে নির্মাণ করেছিলো, তা সঠিক করে বলা কঠিন। ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে এক মত হতে পারেননি। কেউ বলেছেন, ২৫৩২ সালে রাজা খাফ্রে এটি নির্মাণ করেন। আবার কেউ বলেছেন, রাজা খুফু এটি নির্মাণ করেন।

মূর্তিটির সম্মুখের পা দুটো থাবার মতো করে বসানো। দেখলে মনে হবে, এটি থাবা দেয়ার জন্য প্রস্তুত, যে কোনো সময় থাবা মারতে পারে। সম্মুখ ও পেছনে সম্পূর্ণ মূর্তিটি ১৫০ ফুট দৈর্ঘ। মূর্তিটি যে থাবা বিস্তার করে বসে রয়েছে, এই থাবা ৫০ ফুট লম্বা। মাথাটি ৩০ ফুট লম্বা এবং ১৪ ফুট চওড়া। মহাকালের আবর্তন ও বিবর্তনে এই মূর্তিটি অনেকবার মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়েছে। ১৯০৫ সালে সম্পূর্ণ বালি পরিষ্কার করে এটিকে দর্শনীয় করে তোলা হয়েছে।

মিসরে প্রাচীন নিদর্শন লুণ্ঠনের প্রতিযোগিতা

১৬০০ শতকেই বৃটেন, ইতালী, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের চোখ পড়ে মিসরের খনিজ সম্পদ ও এসব পিরামিডের দিকে। তারা তখন থেকেই পর্যটকের বেশে মিসরে এসে দীর্ঘ কাল অবস্থান করে পিরামিড নিয়ে গবেষণা করতে থাকে এবং নানা ধরনের দুর্লভ প্রাচীন জিনিস আবিষ্কার করে গোপনে মিসর থেকে নিজ দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পাচার করে চড়া মূল্যে বিক্রি করতে থাকে। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশরা মিসরীয় গবেষণা পরিষদ গঠন করে এবং ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ

মিউজিয়ামের উদ্বোধন করা হয় এবং সেখানে মিসরের নানা ধরনের দুর্লভ বস্তু সেখানে সংরক্ষণ করা হয়। ১৮০৫ সাল থেকে ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত মিসরে মুহাম্মাদ আলীর সরকার ছিলো, তিনি ইউরোপীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য দুতাবাসগুলোর কাছে মিসরের স্মৃতিচিহ্নগুলো উন্মুক্ত করে দেন। ঠিক তখনই এক নতুন ও অপ্রতিরোধ্য উৎসাহে মিসরে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন লুণ্ঠনের ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। একদল পুরানির্দশন কারবারী এভাবেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে মিসরের প্রাচীন নিদর্শনগুলো পাচার করে দেয়।

১৯২৩ সালে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তুসহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় ফিরআউন টুতেনখানেম-এর সৌধ আবিষ্কার হবার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, পোল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশ মিসরের প্রাচীন নির্দশন সংগ্রহ করার জন্য যেসব সংস্থা গঠন করেছিলো, তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে মিসরের দিকে পুনরায় ছুটে আসে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ করার জন্য। তদানীন্তন মিসর সরকার তাদের অশুভ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে নির্দেশ জারি করে যে, মিসরের পুরানিদর্শন একমাত্র মিসরের কায়রো যাদুঘরেই রক্ষিত থাকবে। এই নির্দেশের ফলে পশ্চিমা খননকারীদের মধ্যে উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়লেও তারা গোপনে পুরানির্দশন নিজেদের দেশে পাচার করতে থাকে।

কায়রো মিউজিয়াম

পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম মিসরের পিরামিড দেখে আমরা ফিরে এলাম কায়রো শহরের কেন্দ্রভাগে আল তাহ্‌রির স্কয়ারে নির্মিত কায়রো যাদুঘরে। মিসরে অনেকগুলো যাদুঘর বা মিউজিয়াম রয়েছে। যেমন কায়রো মিউজিয়াম, খৃষ্টানদের কপটিক মিউজিয়াম, মিউজিয়াম অব ইসলামিক আর্ট, আল জোহ্‌রা প্যালেস মিউজিয়াম, দ্যা মিলিটারী মিউজিয়াম, আল মানিয়াল প্যালেস মিউজিয়াম, দ্যা ইজিপ্‌শিয়ান সিভিলাইজেশন মিউজিয়াম, দ্যা এ্যাগ্রিকালচার মিউজিয়াম, মিউজিয়াম অব বিইথ ইল উম্মা, মুখতার মিউজিয়াম, মিউজিয়াম অব আবেদিনসহ এ ধরনের অনেক মিউজিয়াম রয়েছে। তবে এর মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত হলো কায়রো মিউজিয়াম। এ জন্য আমরা অন্যগুলো বাদ দিয়ে কায়রো মিউজিয়ামই দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এই যাদুঘর প্রথম তৈরী হয়েছিলো ১৮৫৮ সালে বুলাক্ক নামক স্থানে। এটি ১৮৬৩ সালের ১৮ই অক্টোবর মিসরের রাষ্ট্র প্রধান ইসমাঈল পাশা উদ্বোধন করেন।

যাদুঘরের জন্য ফ্রান্সের প্রত্নতত্ত্ববিদ অগাস্ট মারিইটি বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে ১৮৯১ সালে গিজাতে শাসক ইসমাঈল পাশার প্রাসাদে এই যাদুঘর স্থানান্তরিত হয়েছিলো। পরিশেষে বর্তমান তাহ্‌রির স্কয়ারে এই যাদুঘর স্থাপিত হয়। বর্তমানের এই ভবন ১৮৯৭ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে নির্মাণ করা হয়। ফ্রান্সের স্থাপত্যবিদ মারসেল ডরগ্নন এই ভবনের নকসা তৈরী করেন এবং তারই তত্ত্বাবধানে এই ভবন নির্মিত হয়। বর্তমান যাদুঘর জনসাধারণের জন্য ১৯০২ সালের ১৫ই নভেম্বর উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

এই ভবনে ১৭০টি হল রুম রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ১০ হাজারেরও অধিক জিনিস রাখা হয়েছে প্রদর্শনীর জন্য। অবশিষ্ট অনেক কিছু রাখা হয়েছে স্টোর রুমে। সারা বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বেশী সংগৃহিত জিনিস রয়েছে এই যাদুঘরে। কায়রো মিউজিয়ামে প্রবেশ মূল্য জন প্রতি ৪০ পাউন্ড এবং সবথেকে বড় ফিরআউনের মমি দেখার জন্য আরো ৮০ পাউন্ড ব্যয় করতে হয়।

গবেষকদের মধ্যে অনেকেই উল্লেখ করেছেন, এই ফিরআউনই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের পিছু নিয়ে নীলনদে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছিলো। ইতিহাসে এই ফিরআউনের নাম দ্বিতীয় রামসীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফিরআউনের এই মমি বা কায়রো যাদুঘর দেখার জন্য প্রত্যেক দিন হাজার হাজার পর্যটক এখানে আগমন করে থাকে। প্রধান সড়কের পাশেই এই যাদুঘর অবস্থিত এবং যাদুঘরের সম্মুখ ভাগে রয়েছে সবুজ ঘাসে মোড়ানো বেশ প্রশস্ত মাঠ। এখানে রয়েছে নানা ধরনের ফুলের গাছ এবং অন্যান্য বৃক্ষ। বিশাল অট্টালিকার মাঝামাঝি স্থানে লোহার কালো রং-এর নকশা করা গ্রীলের বিশাল গেইট। মেটে লাল রং-এর যাদুঘরের ওপরে মিসরীয় জাতীয় পতাকা উড়ছে। প্রবেশ পথে প্রহরায় রয়েছে অনেক পুলিশ।

ভিতরে যাবার সময় ক্যামেরা সাথে নিলে অতিরিক্ত ১০ পাউন্ড গুণতে হয়। ভিতরের নানা জিনিসের ছবি তোলা যাবে কিন্তু ক্যামেরার ফ্লাশ লাইট ব্যবহার করা যাবে না। যাদুরের ঘরের ভিতরে তেমন ঝলমলে আলোর ব্যবস্থা নেই। অতিরিক্ত আলোর কারণে প্রাচীন জিনিসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, এ কারণেই বোধহয় তেমন উজ্জ্বল আলো নেই। ভেতরে প্রবেশ করার সময় হাত ব্যাগ থাকলে গেটেই নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে জমা দিতে হয় এবং দুইবার নিরাপত্তা তল্লাশী করা হয়। বাইরে থেকে কেউ ধারণাও করতে পারবে না যে, এই যাদুঘরে কি রয়েছে।

যাদুঘরে শুধু প্রাচীন নিদর্শন অথবা মানুষের মৃতদেহের মমিই নেই, প্রাচীন রাজাদের ব্যবহৃত নানা ধরনের জিনিস এবং মাছ থেকে শুরু করে নানা ধরনের প্রাণীর মমিও

রয়েছে। গবেষকগণ বলেন, জ্ঞানের আলো বর্জিত এক শ্রেণীর মিসরীয়রা সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষ, তরুলতা, পাথর ও নানা ধরনের প্রাণীর পূজা করতো। তারা যেসব প্রাণীর পূজা করতো, সেসব প্রাণীর মৃতদেহ মমি করে রাখতো। বড় ধরনের সামুদ্রিক মাছ, বাজপাখি, কুকুর-বিড়াল, বানর, গরু-মহিষ ইত্যাদির পূজা করতো এবং এসব প্রাণীর মৃতদেহ মমি করে পিরামিডের মধ্যে রাজার শবাধারের পাশে রাখতো। খনন কাজের মাধ্যমে এগুলো উদ্ধার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যাদুঘরসহ মিসরের কায়রো যাদুঘরেও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

এই যাদুঘরের নীচ তলায় রয়েছে শুধু খোদাই করা বিশাল আকৃতির অসংখ্য শিলামূর্তি ও নানা ধরনের ভাস্কর্য। দোতলায় রয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোটো ভাস্কর্য, প্রতিমূর্তি, নানা ধরনের রত্নরাজি, তুটানখানম-এর সম্পদ, স্বর্ণের সিংহাসন, স্বর্ণের মুকুটসহ অন্যান্য জিনিস ও মমি। এই ভবনের মধ্যে একটি অংশে রয়েছে যেখানে অসংখ্য ছবি আছে। আরেকটি অংশে বিশাল লাইব্রেরী রয়েছে। হলগুলোর মধ্যে সবথেকে আকর্ষণীয় হলো, তুটানখানম-এর গ্যালারী, আখেনাটেন রুম, জুয়েলারী রুম, ওল্ড কিংডম রুমস্ এবং মমিস্ হল। যাদুঘরটিকে বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম ভাগে রয়েছে তুটানখানম-এর অতুলনীয় ঐশ্বর্যরাজি, দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে প্রাক-রাজবংশীয় এবং প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নসমূহ। তৃতীয় ভাগে রয়েছে প্রথম মধ্যবর্তীকাল এবং মধ্যযুগীয় স্মৃতিচিহ্ন। চতুর্থ ভাগে রয়েছে আধুনিককালের নানা বস্তু ও স্মৃতিচিহ্ন। পঞ্চম ভাগে রয়েছে গ্রীক ও রোমান যুগের নানা জিনিস। ষষ্ঠ ভাগে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন মুদ্রা এবং প্যাপিরাস পত্র। প্যাপিরাস হলো সেই বস্তু- যা হাতে প্রস্তুত করা কাগজে নানা ধরনের বর্ণমালা, বিভিন্ন জিনিসের চিত্র ও দলিল-দস্তাবেজ। সপ্তম ভাগে রয়েছে নানা ধরনের শিলালিপি, মূর্তি ও ভাস্কর্য।

ফিরআউন পরিচিতি

ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ বলেন, আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩১১০ সালে নিম্ন ও উচ্চ এই দুই পৃথক রাজ্যে মিসর বিভক্ত ছিলো। উচ্চ মিসরের রাজা মেনেস নিম্ন মিসরীয় রাজ্য দখল করে এই দুই রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে পরিণত করেন। তিনিই মিসরের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মেনেস এবং তিনি পে-রো, ফেরো উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে হিব্রু এটি পরিবর্তন হয়ে 'ফিরআউন' শব্দে রূপান্তরিত হয়। অভিধানবিদগণ প্রাচীন মিস্রীয় শব্দ পে-রো শব্দের অর্থ করেছেন 'বড় বাড়ি' আর হিব্রু ভাষায় 'ফিরাউন' শব্দের অর্থ 'সূর্যদেবতার সন্তান'।

প্রাচীন মিসরবাসী সূর্যকে 'মহাদেব' বা 'পরমেশ্বর' হিসেবে পূজা করতো। সূর্যকে তারা বলতো 'রাই' এবং এই রাই শব্দের সাথেই ফিরাউনের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। মিসরীয়দের বিশ্বাস ছিল যে, কোনো শাসক দেশ শাসনের ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব কেবল তখনই পেতে পারে, যদি সে 'রাই' দেবতার রূপ ধারণ করে এবং এই পৃথিবীতে তার প্রতিভূ বা প্রতিনিধি হিসেবে আসে। এ কারণে মিসরে যে রাজবংশই ক্ষমতাসীন হতো, সে-ই নিজেকে সূর্য দেবতার বংশের একজন বলে প্রচার করতো আর যে শাসকই ক্ষমতাসীন হতো, সে-ই 'ফিরাউন' উপাধি গ্রহণ করে দেশবাসীকে এই ধারণা দিতো যে, সে-ই তাদের 'পরমেশ্বর' বা 'মহাদেব।'

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের আগমনের তিন হাজার বছর পূর্ব থেকে আরম্ভ করে ইস্কান্দারের শাসনকাল পর্যন্ত ফিরআউনদের একত্রিত বংশধর মিসরের ওপর শাসনকার্য পরিচালিত করেছে। এই বংশের সর্বশেষ বংশধর ছিল পারস্যের শাসকদের বংশধর। এই পারস্য হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের আবির্ভাবের ৩৩২ বছর পূর্বে ইস্কান্দার কর্তৃক বিজিত হয়। এই ফিরআউনদের মধ্যে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ফেরাউন হীক্সূস আমালেকা বংশ হতে উদ্ভূত ছিলেন এবং তা আরব বংশধরগুলোরই একটি শাখা ছিল। এখন প্রশ্ন হলো, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যে সময়ে নবী-রাসূল হিসেবে আগমন করেছিলেন এবং তাঁর সাথে যে ফেরাউনের সংঘর্ষ হয়েছিল সে কোন্ ফিরআউন ছিল?

সাধারণ আরব ঐতিহাসিকগণ এবং কোরআন পাকের তফ্সীরকারগণ এই ফিরআউনকেও আমালেকা বংশেরই একজন দাম্ভিক অত্যাচারী কাফির বলে থাকেন এবং কেউ তার নাম ওলীদ ইবনে মুছআব ইব্নে রাইয়্যান বলেন। আবার কোনো ঐতিহাসিক তার নাম মুছ্আব ইবনে রাইয়্যান বলেন। এসব ঐতিহাসিকদের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানীদের বা গবেষকদের ধারণা হলো, তার নাম 'রাইয়্যান' অথবা 'রাইয়্যানে আব্বা' ছিল।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে কাছীর (রাহঃ) বলেন, তার উপনাম ছিল 'আবু মোররাহ্'। এ মন্তব্য প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিকদের তত্ত্ব বিশ্লেষিত বর্ণনা বা গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের নতুন মিসরীয় গবেষকদের তত্ত্বানুসন্ধানে এবং শীলালিপির পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে অন্য প্রকারের মতামত তুলে ধরে বলা হয়েছে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের যুগের ফিরআউন দ্বিতীয় রীমসীসের পুত্র 'মিন্ফাতাহ্'।

এখানে একটি বিষয় স্মরণে রাখতে হবে যে, মহাগ্রন্থ আল কোরআন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ইতিহাস যেভাবে বর্ণনা করেছে, তাতে করে এটা স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়, সে হযরত মূসার সময়ে মিসরে দুইজন ফিরআউন ছিলো। এরমধ্যে একজন সেই ফিরআউন– যার শাসনামলে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আগমন করেন এবং উক্ত ফিরআউনের তত্ত্বাবধানে এবং তার প্রাসাদেই রাজকীয় পদ্ধতিতে লালিত-পালিত হন।

এই ফিরআউনের মমি, শবাধার ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্ন কায়রো ও লন্ডনসহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি যাদু ঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রথম রামসীস-এর আনুমানিক বয়স ছিলো ৭০ বছর এবং প্রাচীন রীতি অনুসারে তিনি সহ-রাজত্ব প্রথা পুনরায় প্রবর্তন করেন। তার পুত্রকে সহ-ফারাও বা ফিরআউন পদে অভিষিক্ত করেন এবং রাজ্য শাসনের কাজে তাকে নিয়োজিত করেন।

আর দ্বিতীয়জন হলো সেই ফিরআউন– যার কাছে তিনি এবং হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম তাওহীদের দাওয়াত পৌছান এবং বনী ইসরাঈলীদের মুক্তি দাবী করেন। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে আল্লাহ নবী ও এই ফিরআউনের সাথে সংঘর্ষের সূচনা হয় এবং ফিরআউন আল্লাহর নবীর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে নীলনদে ডুবে প্রাণ হারায়।

বর্তমানকালের ঐতিহাসিক ও গবেষকদের ধারণানুসারে প্রথম ফিরআউন ছিল 'দ্বিতীয় রামসীস।' তার শাসনকাল ছিল খৃস্টপূর্ব ১২৩৪ থেকে ১৩০০ সন পর্যন্ত এবং তিনি ১৮ বা ২৫ বছর বয়সে সিংহাসন লাভ করেন। তবে এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যে ফিরআউনের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছান, বনী ইসরাঈলীদের মুক্তি দাবী করেন এবং যার সাথে তাঁর সংঘর্ষের সূচনা হয়, সেই ফিরআউনের উচ্চারণ ভেদে কয়েক ধরনের নাম পাওয়া যায়। যেমন 'মুনফাতা, মিনফাতাহ্, মের এন পিটাহ্ বা মেরেন পিটাহ্।

দ্বিতীয় 'রামসীস'-এর জীবদ্দশায়ই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করার কারণে পিতার মৃত্যুর পরে সারা মিসরের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে। কিন্তু ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এ ব্যাপারে সন্দেহ মুক্ত হতে পারেননি। কারণ বনী ইসরাঈলীদের ইতিহাসের হিসাব অনুসারে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালের তারিখ হলো খৃষ্টপূর্ব ১২৭২ সন। আর দ্বিতীয় রামসীস-এর রাজত্বকাল দেয়া হয়েছে ১২৩৪ থেকে ১৩০০ খৃষ্টপূর্ব সন।

অর্থাৎ তাদের হিসাব অনুসারে ফিরআউনের পূর্বেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মৃত্যু হয়েছিলো। তাহলে এই ফিরআউন আল্লাহর নবীর পিছু নিয়ে পানিতে ডুবে মরলো কখন? সুতরাং তাদের হিসাবে বেশ গড়মিল পরিলক্ষিত হয়। এটা নিছক ঐতিহাসিক ধারণা-অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নয়। বিশেষ করে মিসরীয়, ইসরাঈলী ও খৃষ্টানদের সন-তারিখের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ নির্ভুল হিসাব করা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

তবে ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম রামসীস যেমন দাম্ভিক ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন, তার তুলনায় দ্বিতীয় রামসীস আরো বেশী দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিলো। এরা দুইজনই সন্দেহের বা অহঙ্কার বশত অগণিত শিশু ও নারী-পুরুষকে হত্যা করেন এবং তৎকালীন লেখন পদ্ধতি অনুসরণ করে ফিরআউনের কথা এভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে যে, 'আমি শত্রু বংশের শেষ কাঁটা পর্যন্ত উপ্ড়ে ফেলেছি। আমি কাদেশ-এর মাঠগুলো মৃতদেহ দিয়ে সাদা করে ফেলেছি। এদের বিপুল সংখ্যার জন্য মানুষ যেনো বুঝতে না পারে কোথায় পা ফেলতে হবে এবং লক্ষ লক্ষ বিদেশীকে পরাজিত করেছি। তাদের হাজার হাজার সংঘবদ্ধ দলকে আমার এই শক্তিশালী হাত দিয়ে নিধন করেছি।'

এই অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ যে বনী ইসরাঈলীদের ওপর অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, ইতিহাস এ কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছে। আর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এই বনী ইসরাঈলীদের মুক্তির দাবী ঐ ফিরআউনের কাছেই করেছিলেন। প্রথম রামসীস ও দ্বিতীয় রামসীস সন্দেহাতীতভাবেই দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিলো। কারণ মহাগ্রন্থ আল কোরআনেও তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বলেছিলেন, 'জালিম সম্প্রদায়ের কাছে যাও-ফেরআউনের সম্প্রদায়ের কাছে-তারা কি ভয় করে না?' (সূরা আশ্ শুআরা ১০-১১)

বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তা'য়ালার ভালোবাসা ও করুণার কোনো তুলনাই হয়না। কিন্তু বান্দা যখন সীমারেখা অতিক্রম করে, তখন তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই বান্দাকে জালিম হিসেবে উল্লেখ করেন। ফিরআউনও মহান আল্লাহর বান্দাই ছিলো এবং তারা যখন সীমালংঘন করলো, তখনই তিনি তাদেরকে জালিম হিসেবে উল্লেখ করে উপদেশ দেয়ার জন্য হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে নির্দেশ দিলেন।

অনুসন্ধানকারী দল সীনা উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে ফিরআউনের লাশ পেয়েছিলো, সে স্থানটি এখনও বর্তমান রয়েছে। বর্তমানকালে এই জায়গাটিকে বলা হয় 'ফিরাউন

পর্বত'। এই পর্বতের কাছে একটি উষ্ণ কূপ রয়েছে। স্থানীয় লোকজন এই কূপকে 'ফিরআউনের হাম্মাম' বা 'ফিরআউনের স্নানাগার' বলে। এই কূপ আবু যনীমা নামক স্থান থেকে বেশ কয়েক মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসীরা একেবারে নিশ্চিতভাবে ধারণা দেয় যে, এখানেই ফিরআউনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল।

অভিশপ্ত ফিরআউনের লাশের পাশে

আল্লাহর নবীর পিছু ধাওয়া করে নীলনদে ডুবে মরা ফিরআউন যদি সেই 'মুনফাতা, মিনফাতাহ্, মের এন পিটাহ্ বা মেরেন পিটাহ্ ফিরআউনই হয়ে থাকে, যাকে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সময়ের ফিরআউন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে তার লাশ বর্তমানে কায়রো'র জাদুঘরে রয়েছে– যা আমি আমার সফর সাথীদের নিয়ে নিজ চোখে দেখে এসেছি। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটন ইলিয়ট স্মীথ ফিরআউনের মমি'র ওপর থেকে যখন আচ্ছাদন খুলে ফেলেছিলেন, তখন সেই লাশের উপর লবনের একটা ঘন স্তর জমে থাকতে দেখা গিয়েছিল। লাশের ওপর লবনের স্তর লবনাক্ত পানিতে ডুবে মরার এক বাস্তব প্রমাণ।

ফিরআউনের ডুবে মরা ও তার লাশ সংরক্ষণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন, 'আর আমি বনী-ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে নিলাম! ঐদিকে ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী জুলুম ও বাড়াবাড়ি করার জন্য তাদের পিছনে ছুটে চললো। শেষ পর্যন্ত ফিরাউন যখন ডুবে যেতে লাগলো, তখন বলে উঠলো, 'আমি মানছি যে, প্রকৃত ইলাহ তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যার প্রতি বনী-ইসরাঈলের লোকেরা ঈমান এনেছে আর আমিও আনুগত্যের মস্তক নতকারীদের মধ্যে একজন। (জওয়াব দেয়া হলো) 'এখন ঈমান আনছো, অথচ এর পূর্ব পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে আর বিপর্যয়কারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশকেই রক্ষা করবো, যেন তুমি পরবর্তী বংশধরদের জন্য উপদেশ লাভের প্রতীক হয়ে থাকো। যদিও অনেক লোকই এমন, যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি চরম গাফিলতির আচরণ দেখাচ্ছে।' (সূরা ইউনুস-৯০-৯২)

কায়রো যাদুঘরের সবথেকে আকর্ষণীয় হলো ৫৫ নং হল রুম। এই হল রুমের নাম মমিস্ হল– এখানেই মমিগুলো রাখা হয়েছে। এই রুমের আলো অন্যান্য রুমের তুলনায় বেশ অনুজ্জ্বল। এখানে ১১ জন রাজা-রাণীর মমি রাখা হয়েছে, যার মধ্যে অভিশপ্ত সেই ফিরআউনের মমিও রয়েছে। কাঁচের বাক্সের মধ্যে মমিগুলো রাখা হয়েছে এক কোণায় তার পরিচয় লিখা রয়েছে। কায়রোর যাদুঘরে বর্তমানে রক্ষিত

ফিরআউনের মমিতে তাকে মাথার পিছন দিকে কয়েকগুচ্ছ সাদা চুল ছাড়া টাক মাথা কুঁকড়ে যাওয়া বৃদ্ধ এক শয়তানের মতোই দেখা যায়। গোটা চেহারায় পাশবিকতা ও নির্যাতকের চিহ্ন স্পষ্ট। হাত-পায়ে নখ রয়েছে এবং মুখে একটি দাঁতও অবশিষ্ট রয়েছে। দেহের চামড়া রয়েছে এবং সমস্ত মমিই সাদা কাপড়ে জড়ানো শুধু মাথা, কাঁধ এবং বুকের ওপর ভাঁজ করা দুই হাতের কব্জি খোলা রয়েছে। এখানে যাদের মমি রয়েছে তাদের মধ্যে ৮ জন হলো, আহ্‌মুস-১, আমেনহোটেপ-১, তুতমুসিস-১, তুতমুসিস-২, তুতমুসিস-৩, সেটি-১, রামসীস-২, রামসীস-৩।

এই সেই অভিশপ্ত ফিরআউন, যে ব্যক্তি নিজেকে রব হিসেবে দাবী করে বলেছিলো—হে মিসরবাসীরা! আমি তোমাদের প্রধানতম রব। (সূরা নাযিআত)

ফিরআউন দরবারের সমস্ত লোকদের সম্বোধন করে বলেছিল—হে আমার জাতি! মিসরের রাজত্বের মালিক কি আমি নই? আর এ নদীগুলো কি আমার অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না? (সূরা যুখরুফ)

ফিরআউন নিজের সভাসদদের সামনে এভাবে হুংকার দিয়ে বলেছিল—হে জাতিয় নেতৃবৃন্দ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ্ আছে বলে আমি জানি না। (সূরা কাসাস)

আল্লাহর নবী হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিস্ সালামকে এই শয়তান প্রশ্ন করেছিলো— আচ্ছা, তাহলে তোমাদের দু'জনের রব কে হে মূসা? হযরত মূসা জবাব দিলেন, আমাদের রব তিনি যিনি প্রত্যেক জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন তারপর তাকে পথ নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা ত্বা-হা)

হতভাগার সাধ হয়েছিলো মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহাশক্তিধর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে চ্যালেঞ্জ করার। এ জন্য সে তার দরবারের প্রধানমন্ত্রী হামানকে নির্দেশ দিয়েছিলো— হে হামান! কিছু ইট পোড়াও এবং আমার জন্য একটি উঁচু ইমরাত নির্মাণ করো। আমি উপরে উঠে একবার দেখি তো এই মূসা কাকে ইলাহ বানাচ্ছে। (সূরা কাসাস)

আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে কারাগারে বন্দী করার হুমকি দিয়ে ফিরআউন দম্ভভরে বলেছিলো— যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ বলে মেনে নাও, তাহলে কারাগারে যারা পচে মরছে তোমাকেও তাদের দলে ভিড়িয়ে দেবো। (সূরা শু'আরা-২৩-২৯)

এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, মহান আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী ফিরআউন ও তার দলবল আদালতে আখিরাতে বিচার শেষে জাহান্নামে যাবে এবং মৃত্যুর পর থেকেই তারা জাহান্নাম অপেক্ষা লঘু আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিরআউন ও তার সাথীদেরকে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের আগুনের সম্মুখে উপস্থিত করা হচ্ছে যেনো তাদের মধ্যে এই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে, হাশরের ময়দানের হিসাব শেষে তাদেরকে জাহান্নামের এই কঠিন আযাবেই নিক্ষেপ করা হবে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা ফিরআউনকে দেয়া কঠিন শাস্তি সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহ তা'য়ালা (ফিরআউন গোষ্ঠীর মধ্যে ঈমান আনয়নকারী মুমিন ব্যক্তিকে) তাদের ষড়যন্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউন দলকে (তাদের মৃত্যুর পর) কঠিন আযাব এসে ঘিরে ধরলো। (সেটা হলো জাহান্নামের আগুনের আযাব)। তারপর কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে, তখন আদেশ হবে, ফিরআউন ও তার অনুসারী দলকে অধিকতর কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।' (সূরা আল মু'মিন, আয়াত নং-৪৫-৪৬)

ইতিহাসের সবথেকে বড় শিক্ষা হলো, মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। মহান আল্লাহর নাজিল করা জীবন বিধানের সাথে বিদ্রোহ করার অপরাধে যে মিসরের নীলনদে ফিরআউন ডুবে মরলো, সেই মিসরেই নব্য ফিরআউনরা আল কোরআনের সৈনিকদের সাথে পূর্বের সেই ফিরআউনের মতোই ঘৃণ্য আচরণ করেছে এবং বর্তমানেও করছে। কালের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে গুলী করে ও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বীনি আন্দোলনে আত্মনিবেদিত অগণিত লোকদের ওপরে বর্বর-লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয়েছে। চোখের সম্মুখে রয়েছে মহান আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত ফিরআউনের মৃতদেহ, তবুও এর থেকে কোনো শিক্ষাই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী গ্রহণ করছে না। মহান আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা, যারাই মহান আল্লাহর দ্বীনের সাথে বিদ্রোহ করবে, তারাই ফিরআউনের অনুসারী এবং এরদের মৃত্যুর পরেই আযাব এসে ঘিরে ধরবে ও পরিশেষে জাহান্নামে যাবে। এ বিষয়টি জানার পরও এক শ্রেণীর অবিশ্বাসী জালিমের দল দ্বীনি আন্দোলনের সাথে ফিরআউনের অনুরূপ আচরণ করছে।

মৃতদেহ কিভাবে মমি করা হতো

সেই ১৬০০ শতক থেকেই মিসরের পুরানিদর্শনসমূহের দিকে পশ্চিমাদের চোখ পড়ে এবং তখন থেকেই তারা উদ্ধার করা মমির ওপর গবেষণা শুরু করে। তবে ইতোপূর্বের গবেষকদের মতামতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বর্তমানকালের গবেষকগণ বলেন, মমিকরণে দেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে জলীয় পদার্থ বের করে দেওয়া হতো এবং দেহের অভ্যন্তরীণ জিনিসগুলো একটি শুকনো পাত্রে রাখা হতো। এগুলোর সাথে এমন ধরনের জিনিস ব্যবহার করা হতো, যা আর্দ্রতা থেকে দেহের কোষগুলোকে রক্ষা করে।

প্রথমে তারা লোহার আংটা ধরনের জিনিস নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মাথার ঘিলু ও অন্যান্য লালাগ্রন্থিগুলো বের করে নিতো। এগুলো করার প্রথমে তারা মৃতদেহে সুগন্ধী ওষুধ মাখাতো। এরপর তারা সে যুগের ইথিয়পিয় ধারালো ও সূচালো পাথর দিয়ে মৃতদেহের পাঁজর এবং জঙ্ঘের মধ্যে ছিদ্র করে সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি বের করতো। এরপর দেহটি পাম নামক এক ধরনের তরল পদার্থ দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতো।

এরপর ধুপ বাদ দিয়ে অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য চূর্ণ করে তা দিয়ে মৃতদেহের অভ্যন্তর দিক পরিপূর্ণ করতো। তারপর মৃতদেহটি সেলাই করে তা শোধক লবণ দিয়ে ভিজিয়ে প্রায় ৭০ দিন রেখে দিতো। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে পুনরায় মৃতদেহটি পাম নামক তরল পদার্থ দিয়ে ধুয়ে মুছে ছোটো ছোটো সরু কাপড়ের পাড়ের মতো কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ দেহটিকে মোড়াতো।

সরু পাড়ের মতো কাপড়ের একটি করে স্তর দিয়ে তার ওপর এক ধরনের আঠালো পদার্থ দিতো এবং পুনরায় এর ওপর কাপড়ের আরেকটি স্তর মোড়াতো। এরপর বড় যে কাপড়ে মমি মোড়ানো হতো, তাতে হায়েরোগ্লিফ লিপিতে নানা বিষয় লেখা হতো। বহু শতাব্দীর ব্যবধানেও মমির এই কাপড় খুবই অটুট অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এরপর যে মমি রাখার জন্য যে শবাধার নির্মাণ করা হতো, সেই শবাধারের ওপরে দিকে খুবই দর্শনীয়ভাবে মানুষের মূর্তি কাঠ বা পিতলের ওপর খোদাই করা হতো। এই শবাধার পিরামিডের অভ্যন্তরে মূল সমাধি কক্ষের দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো বা শবাধার রাখার জন্য যে গর্ত বিশেষ প্রস্তুত করা হতো, তার মধ্যেও রাখা হতো। এরপর কক্ষটির দরজা বন্ধ করে দেয়া হতো।

ইংরেজ বাণিজ্য প্রতিনিধি জন স্যান্ডার্সন মিসরে ১৫৮৫ সালে মিসরে গিয়ে দুই বছর সেখানে অবস্থান করেন। তিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার পূর্ব দিকের কবর, গিজার

স্ফিনিকস এবং মেম্ফিসের কাছে গর্তে কতকগুলো মমি আবিষ্কার করেন এবং নিজের দেশে মমি প্রাপ্তির সংবাদ পৌছান। এ সময় সারা ইউরোপে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মিসরে প্রাপ্ত দীর্ঘকাল রক্ষিত মমিভূত দেগুলোব গোস্ত বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ। এই গুজবকে কাজে লাগিয়ে জন স্যান্ডার্সন প্রাপ্ত মমি থেকে গোস্ত ছাড়িয়ে ইউরোপে পাঠিয়ে দেন এবং এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ তা চড়া মূল্যে বিক্রি করতে থাকে। এ কারণেই মিসরে প্রাপ্ত প্রাচীন মমিসমূহের অনেকগুলোরই বিপুপ্তি ঘটেছে। এরপরেও কায়রো যাদুঘরে অনেকগুলো ফিরআউন, তাদের স্ত্রীদের ও আত্মীয়-স্বজনের অক্ষত মমি রয়েছে।

মসজিদে সুলতান হাসান

কায়রো মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে আমরা গেলাম মসজিদে সুলতান হাসানের দিকে। এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন সুলতান হাসান, তিনি ৭৫৭ হিজরী সালে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অর্ধ শতাব্দী যাবৎ মিসরের শাসক ছিলেন। এই মসজিদ গোটা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের নিদর্শন। এই মসজিদের সাথেই রয়েছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। মসজিদে সুলতান হাসানে ছাত্রদের থাকার জন্য রয়েছে ২৯০ টি কক্ষ। হানাফী, মালেকী, হাম্বলী ও শাফে'য়ী– এই চার মাযহাবের ৪ টি মাদ্রাসাও এখানে রয়েছে।

০৭/০৪/২০০৫ তারিখে মিসরে উল্লেখিত এসব কিছু দেখতে দেখতেই দিন ফুরিয়ে এলো। সূর্য মহান আল্লাহর অমোঘ নির্দেশে পশ্চিম গগনে দিকচক্রবালের নীচে নেমে গেলো। সারা দিন ধরে নানা স্থানে গেলাম, ক্লান্তি আমাদের সারা দেহকে অক্টোপাশের মতোই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো। সিদ্ধান্ত নিলাম, আর নয়– এখনই ফিরে যাবো আমাদের থাকার স্থান মিসরের আব্বাসিয়া এলাকার সেই ধূষর রঙের ১১ তলার বাড়ির সপ্তম তলায়। যেখানে জামে আল আযহারে অধ্যয়নরত আমাদের প্রিয় ছাত্ররা আমাদের জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা সকলেই ফিরে এলাম, প্রবেশ পথে ওরা আমাদেরকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো। ওখানে বাংলাদেশী ছাত্র যারা ছিলো, তাদের মধ্যে আমাদেরকে কে কত ভালো রান্না উপহার দিতে পারবে– এ ব্যাপারে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হতো।

সেদিন রান্নার দায়িত্ব ছিলো কাজি বেলালের ওপর। খাবার টেবিলে গিয়ে দেখি থরে থরে সাজানো নানা ধরনের খাদ্য। অপূর্ব রান্না করেছিলো বেলাল। বুদ্ধির বিকাশের পর থেকে আমি কখনোও অতিরিক্ত কোনো খাদ্য গ্রহণ করিনি। মুখে বেশ সুস্বাদু লাগছে, অতএব প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশীই খাই– এই নীতি আমি কখনো অনুসরণ করিনি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য গ্রহণ করার সময় পেটকে তিনভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ খাদ্যদ্বারা পূর্ণ করতেন, অপরভাগ পানি দিয়ে পূর্ণ করতেন এবং আরেকভাগ শূন্য রাখতেন যেনো খাদ্য সহজে পরিপাক হয়। আমিও সর্বত্র সেই নীতিই অনুসরণ করি। খাওয়া শেষ করে নামায আদায় করলাম। তারপর ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবার পূর্বে বরাবরের মতো বাংলাদেশে দ্বীনি ভাইদের সাথে ও পরিবারের সদস্যদের সাথে ফোনে কুশল বিনিময় করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কায়রো থেকে ফাইউম

সেদিন ছিলো জুমাবার- ০৮/০৬/০৫ তারিখ। ফজরের নামায শেষে কিছুটা ঘুমিয়ে নাস্তার টেবিলে এলাম। নাস্তা শেষে স্থানীয় সময় সকাল ৯ টায় বাসা থেকে বের হয়ে পড়লাম। গাড়ির মিসরীয় ড্রাইভার মোহাম্মদ ইব্রাহীম আব্দুর রউফ আগেই এসে হাজির হয়েছিলো। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক এবং মিশুক প্রকৃতির, সবসময় মুখে এক টুকরো হাসি যেনো লেগেই রয়েছে। আমরা গাড়িতে উঠে বসতেই তিনি গাড়ি স্টার্ট দিলেন। কায়রো নগরীর মধ্য দিয়ে গাড়ি দ্রুতবেগে ছুটে চললো। কায়রো শহরে ট্রাফিক আইন হলো, সকাল ন'টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত দূরপাল্লার কেনো গাড়ি শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। শহরের বাইরে নির্ধারিত স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করবে। এই নিয়ম যানজট বা দূর্ঘটনা এড়ানোর সুন্দর কৌশল।

আজকে আমাদের ভ্রমণ সূচীতে অনেক কিছুই রয়েছে। এর মধ্যে মিসরের কৃষিজাত পণ্যের অন্যতম সুন্দর এলাকা ফাইউম ছিলো। এই ফাইউম এলাকায় যাবার পথেও ঐতিহাসিক অনেক কিছুই দেখা যাবে। এ জন্য আমাদের গাড়ি ফাইউমের দিকেই অগ্রসর হলো। রাজধানী শহর কায়রো থেকে ফাইউম শহর ১০৫ কিলোমিটার দূরে। মিসরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, পূর্ববর্তী সকল শাসকই ফাইউমের প্রতি বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এলাকার উন্নতির জন্য যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন করার লক্ষ্যে প্রাচীন মিসরীয় শাসক তৃতীয় আমেন এম হাট ফাইউম থেকে ৫০ মাইল দূরে বিরাট এক জলাশয় খনন করেন। এই জলাশয়ের পরিধি ছিলো ১৪০ বর্গ মাইল, আয়তন ছিলো ৭৫০ বর্গ মাইল, এর গড় পানির তলদেশের পরিমাপ ছিলো ভূমধ্যসাগর থেকে ৮০ ফুট ওপরে। এই জলাশয়ের নাম দেয়া হয়েছিলো মোয়েরিস, এখানে বাহ্‌র-এ ইউসুফ থেকে পানি সরবরাহ করা হতো। আসিউট এলাকার সামান্য উত্তরে নীলনদ থেকে বের হয়ে বাহ্‌র-এ ইউসুফ লিবিয়া পর্বত শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ খাত দিয়ে অগ্রসর হয়ে ২০০ মাইল অতিক্রম করে ফাইউম শহরে প্রবেশ করেছে।

তৃতীয় আমেন এম হাট খৃষ্টপূর্ব ১৯১১ সন থেকে ১৯৫৯ সন পর্যন্ত মিসরের রাজা ছিলেন। ফাইউম প্রদেশের প্রবেশ পথে হাওয়ারা নামক এলাকায় তিনি এক বিশাল পিরামিড নির্মাণ করেন। শুধু ফাইউম নয়– সারা মিসরেই তিনি সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিলেন। বর্তমানকালের ফাইউম এলাকা মিসরের উর্বর প্রদেশগুলোর অন্যতম। বর্তমানে এই এলাকায় নীলনদ থেকে বাহ্‌র-এ ইউসুফের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়। ফাইউম শহর কায়রো শহর থেকেও অনেক পুরনো এবং প্রাচীনকালে ফাইউম শহর মিসরের মধ্যে মেম্ফিস শহর থেকেও উন্নত ছিলো।

কায়রো শহরের মধ্যে অনেকগুলো সুদীর্ঘ ফ্লাইওভার রয়েছে, এগুলো অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি শহরের বাইরে মরুভূমি এলাকায় চলে এলো। মরুভূমিতে ধূষর বর্ণের বালি, যেদিকেই চোখ যায় শুধু বালিই চোখে পড়ে। সকালের সোনালী রোদে মরুপ্রান্তরের বালি রৌপ্যের মতোই চিক্ চিক্ করছে। ধূষর বালির চাদরে আবৃত বিশাল মরুভূমি বুক চিরে পীচ্ঢালা কালো প্রশস্ত পথ ফাইউম প্রদেশের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনে হবে যেনো পীচ্ঢালা এই কালো পথ সাপের মতো এঁকে বেঁকে দিগন্ত রেখার সাথে মিলিত হয়েছে। এক সময় বালির সরোবর অতিক্রম করে আমরা ফাইউম শহরের বাইরের গ্রাম এলাকায় এসে পৌঁছলাম।

সবুজ অরণ্যানী পরিবেষ্টিত গ্রাম এলাকার দৃশ্য বড়ই দৃষ্টি নন্দন ও মনোমুগ্ধকর। মাঠভরা ফসলের ক্ষেত, বাঁধানো রাস্তার দুই পাশেই খেজুর ও আমের বাগান, এসব গাছে নানা ধরনের পাখি এসে ভীড় জমিয়েছে, গাড়িতে বসেই আমরা পাখির কলকাকলী শুনতে পাচ্ছি। ফাইউমের একদিকে মরুভূমি হলেও অন্যদিকে রয়েছে বিশাল কৃষি এলাকা। এই এলাকাকে ফাইউম মরুদ্যান বলা হয়। এখানের পরিবেশ কায়রোর কোলাহল মুখর পরিবেশ থেকে শান্ত ও নীরব। কৃষির উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য এখানে একটি সুবিশাল এগ্রিকালচারাল সেন্টার রয়েছে। আম, কলা, কমলা ভুট্টা, বাঁধা কপি ও নারকেলসহ প্রচুর ফলমূল এবং শাক-সব্জি উৎপন্ন হয়।

হানা হয়েছিলো যেখানে আযাবের চাবুক

ফাইউমে যাবার পথে আমরা প্রথমে পৌঁছলাম সেই স্থানে– যেখানে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিশ্বাসঘাতক কারূণ মহান আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়ে তার যাবতীয় সম্পদসহ মাটির অতল তলদেশে তলিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে সে স্থানটি বিশাল এক

জলাশয় বিশেষ। এর নাম দেয়া হয়েছে বুহায়রা কারূণ, মিসরের টুরিষ্ট গাইডে এই স্থানের নাম 'লেক কারূন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকে ফাইউম প্রদেশ ২০ কিলোমিটর দূরে।

কোনো জাতি বা দল যখন আরেকটি অন্যায়কারী জালিম জাতি, স্বৈরাচারী শাসক বা দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে, তখন সংগ্রামী জাতির ভেতর থেকে এমন কিছু লোক জালিম জাতি, স্বৈরাচারী শাসক বা দলের সাথে গোপনে বা প্রকাশ্যে হাত মেলায়। দেশ, জাতি বা দলের স্বার্থ এদের কাছে গৌণ হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করার জন্য এরা জালিম জাতি, স্বৈরাচারী শাসক বা দলের সাথে হাত মিলিয়ে নিজের জাতির স্বার্থে আঘাত করে, নিজের দলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং নিজের জাতির বা দলের আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রত্যেকটি দেশেই এ ধরনের বিশ্বাসঘাতক লোকের অস্তিত্ব রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি যখন ভিন্ন কেনো দেশের সম্পদ লুট করতে চায় বা সেদেশকে দখল করতে চায়, তখন সংশ্লিষ্ট দেশের এমন লোকদেরকে স্বার্থের বিনিময়ে কাজে লাগায়, যারা জাতিয়ভাবে পরিচিত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ১৭৫৭ সনের ২৩ শে জুন পলাশীর আম্র কাননে এই ধরনের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই প্রায় দুইশত বছরের জন্য বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছিলো এবং মুসলিম দরদী নবাব সিরাজ উদ্দৌলা নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। সিকিম আর ভুটানের জনগণও এই বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের কারণেই আজ স্বাধীনতাহারা। কাশ্মীরের জনগণও ঐ একই বিশ্বাসঘাতকদের কবলে পড়ে রক্তদান করছে। দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়ার জন্য কারূণের মতো বিশ্বাসঘাতকরা সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দেশ ও জাতির সাথে যে কোনো হীনকাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। নিকট অতীতে আমরা আফগানিস্থান ও ইরাকে সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখলাম। এভাবে বর্তমানে প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা অমুসলিমদের স্বার্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে।

ইসরাঈলী জাতির মধ্যে কারূণ ছিল এই ধরণের একজন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি। বনী ইসরাঈলী জাতির প্রতি ফিরআউন নির্মম নির্যাতন চালাচ্ছিলো এবং তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করে রেখেছিলো। এদেরকে কোনো ধরনের সম্মানজনক কাজ করতে দেয়া হতো না। রাষ্ট্রীয় কেনো পদেও এদেরকে গ্রহণ করা হতো না, বরং

ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের দাস হিসেবেই বনী ইসরাঈলীদেরকে বিবেচনা করা হতো। পবিত্র কোর্‌আন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে, হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিস্ সালাম যখন ফিরআউনের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছালেন, তখন সে দম্ভভরে বলেছিলো, 'আমি দাস সম্প্রদায়ের লোকদের আহ্বানে সাড়া দিবো?'

ইতিহাসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী ফিরআউন নামক রাজবংশের লোকজন বনী ইসরাঈলীদেরকে দাস হিসেবেই ব্যবহার করেছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম একদিকে তাদেরকে মহান আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করার দাওয়াত দিলেন, সেই সাথে বনী ইসরাঈলীদের মুক্তিরও দাবি করলেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের নেতৃত্বে যেনো বনী ইসরাঈলীদের স্বাধীনতা আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে না পারে, এ জন্যই বনী ইসরাঈলীদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কারূণকে ফিরআউন হযরত মূসার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিলো। নিজ জাতি স্বাধীনতা লাভ করুক বা ফিরআউনের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাক, এ ব্যাপারে এই ব্যক্তির মাথাব্যথা ছিলো না। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিলো অর্থ-সম্পদ। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম চেষ্টা করছেন, তাঁর জাতিকে গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য, আর কারুণ চেষ্টা করছিল, ইসরাঈলী জাতির শত্রু ফিরআউনের শক্তি বৃদ্ধি করে মূসা আলাইহিস্ সালামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের বিপক্ষে অবস্থান নিলে দেশের শাসক ফিরআউনের কাছ থেকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে এবং তার অর্থ-সম্পদও বৃদ্ধি পাবে, এ জন্যই সে বনী ইসরাঈলীদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। এই লোকটি সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'এ কথা সত্য, কারূণ ছিলো মূসার সম্প্রদায়ের লোক, তারপর সে নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। আর আমি তাকে এতটা ধনরত্ন দিয়ে রেখেছিলাম যে, তাদের চাবিগুলো বলবান লোকদের একটি দল বড় কষ্টে বহন করতে পারতো। একবার যখন এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে বললো, 'অহঙ্কার করো না, আল্লাহ অহঙ্কারীদেরকে পসন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর তৈরী করার কথা চিন্তা করো এবং পৃথিবী থেকেও নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না। অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সূরা কাসাস-৭৬-৭৭)

নিজ জাতির সাথে বিশ্বাঘাতকতা করে কারূণ তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর পদলেহনে ব্যস্ত ছিলো। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ফিরআউন তাকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ দান করেছিলো এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে লোকটি তৎকালীন যুগে শ্রেষ্ঠ ধনকুবের-এ পরিণত হয়েছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারীরা যখন তাকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত থেকে আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য দ্বীনের দাওয়াত দিলেন, তখন লোকটি আপন রব মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করে দম্ভভরে জবাব দিয়েছিলো, 'এতে সে বললো, 'এসব কিছু তো আমি যে জ্ঞান লাভ করেছি তার ভিত্তিতে আমাকে দেয়া হয়েছে।' (সূরা কাসাস-৭৮)

অর্থাৎ আমি আমার জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা, কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে এসব ধন-সম্পদ অর্জন করেছি। কেউ আমাকে অনুগ্রহ করে এসব দান করেনি। এই দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লোক এবং তার অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'সে কি এ কথা জানতো না যে, আল্লাহ এর পূর্বে এমন বহু লোককে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা এর চেয়ে বেশী বাহু বল ও জনবলের অধিকারী ছিলো? অপরাধীদেরকে তো তাদের গোনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় না।' (সূরা কাসাস-৭৮)

ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অহঙ্কারে যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের ঐসব গোষ্ঠীর ধ্বংসের ইতিহাস জানা উচিত, যারা তার তুলনায় অনেক গুণ বেশী অর্থ-সম্পদ ও শক্তির অধিকারী ছিলো। অহঙ্কারের পদভারে তারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। মহান আল্লাহ পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'য়ালা যখন অপরাধীদের ওপরে আযাবের চাবুক হানেন, তখন তাদেরকে এ কথা বলা হয় না যে, 'তোমরা অমুক অপরাধে লিপ্ত ছিলে, এই কারণে তোমাদের ওপরে আঘাত হানা হচ্ছে।' বরং আচমকা তাদের ওপরে আযাবের চাবুক হানা হয়।

কারুণের বিপুল ধন-ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখে সে যুগের একশ্রেণীর লোভী লোকজন মনে করতো, লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। নিজেদের ধন-সম্পদ না থাকার কারণে তারা আক্ষেপ করতো। তাদের আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ শোনাচ্ছেন, 'একদিন সে (কারুণ) তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হলো পূর্ণ জাঁকজমক সহকারে। যারা পৃথিবীর জীবনের ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িত ছিলো তারা তাকে দেখে বললো, 'আহা! কারূণকে যা দেয়া হয়েছে তা যদি আমরা পেতাম! সে তো বড়ই সৌভাগ্যবান।' (সূরা কাসাস-৭৯)

সফলতা ও ব্যর্থতার প্রকৃত মানদন্ড যাদের জানা ছিল না বা যারা পৃথিবীর জীবনে সম্মান-মর্যাদা ও বিপুল ধন-ঐশ্বর্যের অধিপতি হওয়াকেই প্রকৃত সফলতা বলে বিশ্বাস করতো, তারা ধারণা করতো, কারুণ বড়ই সফল ব্যক্তি–লোকটি জীবনে সফলতা অর্জন করেছে। তারা আক্ষেপ করে বলতো, আমরাও যদি কারুণের অনুরূপ সফলতা অর্জন করতে পারতাম! ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত এই মূর্খ লোকগুলোর মূর্খতা দেখে হকপন্থীরা তাদেরকে বলতো, 'তোমরা যাকে সফলতা বলে ধারণা করছো তা সফলতা নয়। প্রকৃত সফলতা হলো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালনা করা। আর ঈমান আনা ও ঈমানের দাবী অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা কেবলমাত্র তাদের পক্ষেই সম্ভব, যারা ধৈর্যশীল।

কারূণের শান-শওকত দেখে যারা আক্ষেপ করতো এবং কারূণকে বড়ই সৌভাগ্যবান লোক হিসেবে বিবেচনা করতো, তাদেরকে সে সময়ের ঈমানদার লোকজন কিভাবে উপদেশ দিয়েছিলো সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, 'কিন্তু যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বলতে লাগলো, 'তোমাদের অবস্থা দেখে আফসোস হয়। আল্লাহর সওয়াব তার জন্য ভালো যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আর এ সম্পদ সবরকারীরা ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না।' (সূরা কাসাস-৮০)

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পুরস্কার শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোর জন্যই নির্ধারিত যাদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা রয়েছে। বৈধ পন্থায় উপার্জন করার ব্যাপারে যারা দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। এই পথে দিন শেষে যদি তাদের ভাগ্যে একটি শুক্‌নো রুটি জোটে তবুও তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে আর যদি বৈধ পথে উপার্জনের মাধ্যমে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়ে যায়, তবুও তারা মহান আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করে। সারা পৃথিবীর সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস, অর্থ-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ার সুযোগ দেখা দিলেও তারা অবৈধ পথের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। অবৈধভাবে তদবীর-তাগাদা করে এবং প্রভাব বিস্তার করে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। বৈধ পথে উপার্জন তা যতো সামান্যই হোক না কেনো, এতেই তারা তৃপ্তি লাভ করে।

পৃথিবীতে যারা অবৈধ পন্থায় উপার্জন করে বিশাল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছে, তাদের শান-শওকত দেখে মনের মধ্যে ঈর্ষা ও কামনা-বাসনার জ্বালায় ব্যাকুল হবার পরিবর্তে ঐসব অবৈধ জাঁকজমকের প্রতি চোখ তুলে না তাকানো এবং ধীর স্থির

মস্তিষ্কে এ কথা অনুধাবন করা যে, মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদারের জন্য পৃথিবীর এ চাকচিক্যময় আবর্জনার তুলনায় এমন নিরাভরণ পবিত্রতাই সর্বাধিক উত্তম যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে তাকে দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক কারূণের ধন-সম্পদ দেখে যেসব লোক তার অনুরূপ ধন-সম্পদ লাভের জন্য লালায়িত ছিলো, কারূণকে যারা সফল ব্যক্তি মনে করতো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা খুব দ্রুত তাদের ধারণা পরিবর্তন করে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতা আর বিপর্যয় সৃষ্টির শেষ সীমা অতিক্রম করলো কারূণ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপরে আযাবের চাবুক হানা হলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার গৃহকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেললাম। তখন আল্লাহর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসার মতো সাহায্যকারীদের কোনো দল ছিল না এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারলো না। যারা আগের দিন তার মতো মর্যাদা লাভের আকাংখা পোষণ করছিলো তারা বলতে লাগলো, 'আফসোস, আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার রিযিক প্রসারিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে সীমিত রিযিক দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমাদেরও ভূগর্ভে পুঁতে ফেলতেন। আফসোস, আমাদের মনে ছিলো না, কাফিররা সফলকাম হয় না।' (সূরা কাসাস-৮১-৮২)

অর্থাৎ আমরা এই ভুলে নিমজ্জিত ছিলাম যে, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই হলো সফলতা। এ কারণে আমরা ধারণা করে ছিলাম যে কারূণ বিরাট সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু তার বর্তমান অবস্থা দেখে আমাদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেলো। আমরা আসল সত্য অনুধাবন করতে পারলাম যে, প্রকৃত সফলতা ভিন্ন জিনিস, যা আল্লাহ বিরোধিদের ভাগ্যে কখনো জোটে না। পবিত্র কোরআনের ভাষণ থেকে জানা যায়, কারূণ নিজের সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলীদের সাথে বিরুদ্ধাচরণ করে এমন শত্রু শক্তির গোলামে পরিণত হয়েছিল, যে বনী ইসরাঈলকে শিকড় সহকারে উপড়ে ফেলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। নিজের জাতির সাথে সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

আর এ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে ফিরআউনের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সে এমন গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদায় অভিসিক্ত হয়েছিল যে, হযরত মূসা ফিরআউন ছাড়াও আরো যে দু'জন বিখ্যাত লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের

দু'জনের একজন ছিল ফিরআউনের মন্ত্রী হামান এবং অন্যজন ইসরাঈলী ধনকুবের কারূণ। রাষ্ট্রের অন্য সভাসদ ও কর্মকর্তারা ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, ৫৫ হাজার একর জমি নিয়ে ছিলো কারূণের বিশাল অট্টালিকা ও সঞ্চিত ধনরাশির ধনাগার। ফিরআউনের সাথে মিলিত হয়ে আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে বিরোধিতা করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই স্থান বর্তমানে বিশাল হ্রদে পরিণত হয়েছে– যা দেখতে সমুদ্রের মতোই মনে হয়।

বর্তমানে এই হ্রদটি আকারে ৬৯২ বর্গ মাইল এবং এর গভীরতা প্রায় ১২ মিটার। এই বিশাল জলাশয়ের তীরে মিসরের বেদুঈন ও পেশায় ধীবর শ্রেণীর লোকজন বাস করে। তারা এই জলাশয় থেকে মাছ ধরে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে লবণাক্ত পানির মাছ পাওয়া যায়। নানা জাতের পাখির কলকাকলীতে গোটা এলাকা মুখরিত। রাস্তা এবং জলাশয়ের পাশেই রয়েছে একটি কারুকার্যময় দোতলা মসজিদ। জলাশয়ের যে তীর রাস্তার পাশে, ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য তা পাকা করে দেয়া হয়েছে।

তবে এই জলাশয়কে কেন্দ্র করে এলাকার লোকদের মধ্যে মাছ ধরার যেমন লোভ রয়েছে, তেমনি আতঙ্কও রয়েছে। মাছ ধরার সময় বা জলাশয়ে ঘুরতে যাবার সময় কেউ যদি একবার ডুবে যায়, তাহলে তার লাশের নাকি কোনোই হদিস পাওয়া যায় না। লেকের তীর ঘেষে পর্যটকদের জন্য বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। একটি রেস্টুরেন্ট খুবই আকর্ষণীয়ভাবে করা হয়েছে। এর তিনদিকে পানি একদিকে ভূমি। এই ভূমিতে নানা ধরনের ফুল গাছ, ক্যাকটাস, পাম, নারকেল ও অন্যান্য গাছ লাগানো রয়েছে ঘন করে। সম্মুখের খোলা চত্বরে কিছুটা ব্যবধান রেখে খেজুর পাতার ছাউনীর নীচে চেয়ার-টেবিল রাখা রয়েছে। এখানে বসে যে কেউ বিশাল জলাশয় দেখতে পারে।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ফসল সংরক্ষণ ভূমি

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে যেখানে আযাবের চাবুক হানা হয়েছিলো সে স্থান দেখে আমরা এগিয়ে গেলাম ফাইউম শহরের দিকে। নীলনদ থেকে খাল কেটে কেটে শস্য ভূমিতে পৌছানো হয়েছে। ফলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন হচ্ছে। মরুভূমির দেশে শস্য উৎপাদন– এটা মহান আল্লাহ তা'য়ালার অসীম কুদরতের নিদর্শন। এগিয়ে যাবার পথে পড়লো আল্লাহর

নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সেই ফসল সংরক্ষণের ভূমি। এই ইতিহাসেরও পেছনে রয়েছে আরেক ইতিহাস। পেছনের সেই ইতিহাস জানা না থাকলে ফসল সংরক্ষণের ভূমির কাহিনী উপলব্ধি করা যাবে না।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক ফসল সংরক্ষণের ইতিহাস সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য এ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক তথ্য জেনে নেয়া খুবই জরুরী। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ছিলেন হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের সন্তান এবং হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালামের পৌত্র ও হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের প্রপৌত্র। হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের চারজন স্ত্রীর গর্ভজাত ১২ জন পুত্র ছিল। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর ছোট ভাই বিনইয়ামিন এক মায়ের সন্তান ছিলেন। আর তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরা ছিল অন্য মায়ের সন্তান।

ফিলিস্তিনে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম ছিলেন ফিলিস্তিনের হিবরুন এলাকা–বর্তমান নাম আল খলীলের অধিবাসী। হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামও এখানেই বসবাস করতেন। এ ছাড়াও সিক্কিম–বর্তমান নাম নাবালুসে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের ভূসম্পত্তি ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, খৃষ্টপূর্ব ১৮৯০ সনের কাছাকাছি সময়ে হযরত ইউসুফের ইতিহাসের প্রাথমিক অধ্যায় সংঘটিত হয়। সে অধ্যায় হচ্ছে, স্বপ্ন দেখা এবং তারপরে কূপে নিক্ষেপ হওয়া। এ সময়ে তিনি ছিলেন মাত্র ১৭ বছরের তরুণ।

বৈমাত্র ভাইগণ হত্যার ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিলো। সে কূপ সিক্কিমের উত্তরে দুতান–বর্তমান নাম দুসান এলাকায় অবস্থিত ছিল। তাঁকে সেই কূপ হতে উদ্ধার করেছিল যে কাফেলা তা পূর্ব জর্দানের জিলয়াদ নামক এলাকা থেকে আসছিলো এবং মিসরের দিকে যাচ্ছিল। জিলয়াদ নামক এলাকার ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে জর্দান নদীর পূর্বদিকে আল ইয়াবিস নামক উপত্যকার পাশে অবস্থিত রয়েছে।

ধৈর্যের প্রতিচ্ছবি

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইগণ কূপে নিক্ষেপ করলো, মিসর যাত্রী বাণিজ্য কাফেলা তাঁকে মিসরে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিলো, তখন তিনি বয়সে ছিলেন কিশোর বা তরুণ। একদিকে তাঁর মা নেই, ছিলেন

পিতার স্নেহের কোলে। সে স্নেহ হতেও তিনি বঞ্চিত হলেন। ছোট ভাইকে হারালেন। অন্যান্য ভাইগণ তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। নিজের জন্মভূমি হতে কোথায় তিনি ছিটকে পড়লেন। তবুও তাঁর ভেতরে কোন চিত্ত চাঞ্চল্য ছিল না। সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার দ্যুতি তাঁর কোমল কান্তি মুখমন্ডলে বিদ্যুতের মতই চমকাতো।

তিনি সামান্যতম আক্ষেপ করেননি বা দুঃখ-যন্ত্রণা প্রকাশ করেননি। আল্লাহর কাছে অভিযোগও করেননি। কোনো মানুষের কাছেও তিনি এ ধরনের সাহায্য চাননি যে, 'আমাকে আমার স্নেহময় পিতার কাছে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন'। এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর চোখ ক্ষণিকের জন্য অশ্রুসজল হয়নি। এসব দিক সামনে রাখলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কি পরিমাণ ধৈর্য ধারণ করতে পারলে মহান আল্লাহ তাঁকে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত করেছিলেন। মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে মহাপরীক্ষায় নিপতিত করে থাকেন।

সে যুগের মিসর শাসক

যে সময়ে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম নিয়তির অমোঘ নির্দেশে মিসরে উপনীত হতে বাধ্য হন, সে সময়ে মিসর দেশের ইতিহাস বিখ্যাত রাখাল বাদশাহদের ঔহপ্রম্র ধিভথ্র পঞ্চদশ বংশের রাজত্ব চলছিল। এই শাসক গোষ্ঠী আরব বংশজাত ছিল এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিন থেকে মিসর পৌঁছে খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের কাছাকাছি সময়ে মিসরের রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করেছিল।

কোরআনের গবেষক ও আরবের ঐতিহাসিকগণ এই শাসকদের জন্য আমালীক নাম ব্যবহার করেছেন। মিসর সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণার সাথে উল্লেখিত তথ্য সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু মিসরে এরা আগ্রাসনকারী বা বৈদেশিক আক্রমনকারী হিসেবে পরিচিত। যে সময়ে এই রাখাল বাদশাহগণ মিসরের শাসন ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল, সে সময়ে মিসর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত ছিল।

এই সুযোগেই তারা মিসরের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিল। আর এরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালেই হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিলেন। যেহেতু মিসরের শাসক শ্রেণী ছিল আরব বংশজাত এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের অধিবাসী, এ কারণেই তারা বনী ইসরাঈলীদেরকে মিসরে সাদরে গ্রহণ করেছিল।

শাসকদের সাথে বনী ইসরাঈলীদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল বিধায় তাদেরকে মিসরের সর্বাধিক উর্বর এলাকায় বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল এবং সেখানে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই শাসকবৃন্দ খৃষ্টপূর্ব পনের শতকের শেষ সময় পর্যন্ত মিসরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল।

এই রাজাদের শাসনকালে মিসরের প্রকৃত শাসক ছিল বনী ইসরাঈলীরা। কারণ এই গোষ্ঠী চিরকালই কুট কৌশলের অধিকারী বলে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। এদেরকে তাদের সমগোত্রিয় শাসক মিসরে এনে নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল, আর এরা পরবর্তীকালে নিজেদের কুট কৌশলের মাধমে মাধ্যমে খোদ শাসকদেরকেই নিয়ন্ত্রণ করতো।

এরপর মিসরে একটি সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। যে আন্দোলন দমন করা শাসকদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ফলে মিসরের অমিসরীয় শাসকদের শাসন ক্ষমতার মর্মান্তিকভাবে অবসান ঘটেছিল। প্রায় আড়াই লক্ষ আমালীক শ্রেণীকে মিশর হতে উৎখাত করে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অগণিত আমালীক শ্রেণীকে হত্যা করা হয়েছিল। এক কথায় মিসরে' সে সময়ে রক্তাক্ত এক অভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং চরম বিদ্বেষী কিবতী সম্প্রদায় শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল।

তারা অমিসরীয় রাজাদের প্রতি এতই বিদ্বেষী ছিল যে, রাজাগণ তাদের শাসনকালে গোটা মিসরে যেসব কীর্তি-চিহ্ন স্থাপন করেছিল, কিবতী শাসকগণ তা ভেঙ্গে ধুলিস্মাৎ করে দিয়েছিল। তারপর তারা অমিসরীয় রাজাদের সমগোত্রীয় বনী ইসরাঈলীদের ওপরে শুরু করেছিল ইতিহাসের লোমহর্ষক নির্যাতন।

প্রাচীন মিসরের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মিসরের শাসন ক্ষমতা দখলকারী অমিসরীয় রাজাগণ মিসরের ক্ষমতা দখল করলেও তারা মিসরের জনগণের সাথে একাত্ম হতে পারেনি। তারা প্রত্যেক কাজে নিজেদেরকে এক ভিন্ন শ্রেণী হিসেবে পৃথক করে রেখেছিল। অর্থাৎ শাসক আর শাসিতে ছিল বিরাট এক প্রভেদ।

শাসকগণ মিসরের জনগণের ধর্ম তথা তাদের দেব-দেবীকে তো গ্রহণ করেইনি, বরং তারা তাদের দেশ থেকে যেসব দেব-দেবীদের আমদানী করেছিল, তা গোটা মিসরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মিসরের জনগণের যে ধর্ম বিশ্বাস ছিল, তাকে পদদলিত করে তারা নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস গোটা মিসরে প্রবলভাবে প্রচার করতো এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতো। এ কারণেই তাদের বিরুদ্ধে মিসরের জনগণের মনে যে ক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছিল, এক সময় তা বিস্ফোরিত হলো।

মিসরের শাসকগণ যেহেতু মিসরের ধর্ম বিশ্বাসী ছিল না, এ কারণে পবিত্র কোরআনে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের সমসাময়িক শাসককে 'ফিরআউন' নামে অভিহিত করা হয়নি। কারণ ফিরআউন শব্দটি ছিল মিসরের ধর্মীয় পরিভাষা। পক্ষান্তরে মিসরের শাসকগণ মিসরের ধর্মকে স্বীকৃতিই দেয়নি, ফলে মিসরের জনগণ তাদেরকে ফিরআউন নামে অভিহিত করতো না।

মিসরের ঐসব শাসককেই ফিরআউন নামক ধর্মীয় উপাধি দেয়া হতো, যারা ছিল খোদ মিসরের ধর্মের অনুসারী এবং এই উপাধি দান করতো মিসরের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, অমিসরীয় রাজাদের মধ্যে যে রাজার নাম মিসরীয় ইতিহাসে 'আপোফীস' Apophi বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই আপোফীস ছিল হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের সমসাময়িক রাজা। এ সময়ে মিসরের রাজধানীর নাম ছিল মমফেস, মনফ বা মিম্ফেস। বর্তমান মিসরের রাজধানী কায়রোর ১৪ মাইল দক্ষিণে তৎকালীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ছায়ায়

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর ১৭/১৮ বছর বয়সে সে সময়ে সেই মিম্ফেস নগরীতেই ভাগ্যচক্রে এসে উপনীত হয়েছিলেন। দুই তিন বছর তিনি আযীয মিসরের বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। তারপর ৮/৯ বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে তাঁর জীবনের সোনালী দিনগুলো কেটে যায়। যে সময়ে তাঁর ৩০ বছর বয়স, তখন তিনি মিসরের কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। এরপর এক সময় মহান আল্লাহ তাঁকে মিসরের শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত মিসরের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

বর্তমান কালের এক শ্রেণীর অসৎ নেতা নেত্রীগণ বলে থাকে ধর্ম আর রাজনীতি পৃথক জিনিষ। এসব দুনিয়া পূজারি ধান্দাবাজ ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দ সততার সাথে দেশ পরিচলনা করতে পারবেন না, এ কারণেই তারা এ ধরণের উদ্ভট মতবাদ আবিষ্কার করেছেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম দেশ পরিচালনা করেছেন, নবুওয়াতের কঠিন দায়িত্বও পালন করেছেন। ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা জিনিষ তা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু তা কোন্ ধর্ম? গোটা পৃথিবীতে ধর্ম বলতে আমাদের সামনে যা আছে, তার কোনো একটি ধর্ম বা ধর্ম গ্রন্থও দাবী করেনা যে আমরা দেশ চালাতে সক্ষম। কারণ এসব ধর্মের বা ধর্ম গ্রন্থের দেশ পরিচালনা করার যোগ্যতা নেই।

কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামকে পৃথিবীর সকল যুগের মানুষের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবেই অবতীর্ণ করেছেন। মানব সভ্যতা ও বিশ্ব পরিচালনার জন্য যা কিছু নীতিমালা প্রয়োজন, তা তিনি পবিত্র কোরআনে দান করেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বনবী হিসেবে প্রেরণ করে তাঁরই মাধ্যমে এই আদর্শ বাস্তবায়ন করিয়েছেন।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম মিসরে তাঁর শাসনামলের ৯/১০ বছরের সময় তাঁর পিতা হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামকে পরিবারবর্গসহ ফিলিস্তিন থেকে মিসরে এনে দিমইয়াত ও বর্তমান কায়রোর মধ্যবর্তী এলাকায় পুনর্বাসিত করেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের যুগ পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর বংশধরগণ এখানেই বসবাস করতে থাকেন।

মিসরের যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে কিনেছিল, সে ব্যক্তির পূর্ণ পরিচয় জানা না গেলেও এ কথা কোরআনের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, সে ব্যক্তি গোটা মিসরে অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও ধনী ছিলো। সেই ক্ষমতাবান ব্যক্তি তাঁকে কিনেছিল দাস হিসেবে নয়, তাকে দেখে তাঁর মনে এক অভূতপূর্ব মায়া-মমতা জেগে উঠেছিল, এ কারণেই সে তাঁকে কিনেছিল।

কেননা, সে সময়ে মিসর ছিল সবদিক হতে একটা উন্নত দেশ এবং মিসরীয়রা নিজেদেরকে উন্নত ও সুসভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। এ কারণে তারা মরুবাসী ও যাযাবরদেরকে চরমভাবে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতো। এই শ্রেণীর লোকজন তাদের শহরে প্রবেশ করলে তারা তাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতো না। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ছিলেন সেই যাযাবর মরুবাসীদের একজন।

তাঁর চেহারার দিকে দৃষ্টি পড়তেই সেই ক্ষমতাবান লোকটি অনুভব করতে পেরেছিল, এই কিশোর বা তরুণ কোন সাধারণ তরুণ নয়, এই তরুণের ওপরে নির্ভর করা যায়, এমন কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে এই তরুণের গোটা অবয়বে। তিনি তাঁকে কিনে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে এ কথা বলেননি যে, একজন নতুন চাকর আনলাম। সুতরাং তার থেকে কিছু দিন সাবধান থাকতে হবে। প্রথমেই তার ওপর বিশ্বাস করা যাবে না। এ কথা না বলে তিনি হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে কি বলেছিলেন, আল কোরআনের ভাষায়, 'মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললো–একে অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখতে হবে। এটা অসম্ভব নয় যে, সে আমাদের উপকারী হবে এবং আমরা তাকে আমাদের সন্তান

বানিয়ে নেব। এইভাবে আমি ইউসুফের জন্য এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করার উপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলাম।' (সূরা ইউসুফ-২১)

যে লোকটা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে কিনেছিল সে ব্যক্তি মিসরের কোন বড় পদাধিকারী বা মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিল। ইবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সে রাজ ভাণ্ডারের 'বড় কর্তা' ছিল।

কামনা তাড়িত এক নারী

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে একের পর আরেক পরীক্ষা করতেই থাকেন। তাদের ওপরে এই পরীক্ষা তাদের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে। কারণ তাদের যেমন সম্মান ও মর্যাদা, আর এই সম্মান ও মর্যাদার সাথে সংগতি রেখেই তাদের ওপরে পরীক্ষা চলতে থাকে। এ সমস্ত পরীক্ষায় তারা সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং মহান আল্লাহর কাছে তাঁরা সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার আসনে আসীন হন।

মহান আল্লাহ হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে তাঁর জন্মের পর থেকেই পরীক্ষা শুরু করেন। শৈশবে তাঁর পরম প্রিয় মা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এরপর বিপদের ঘূর্ণাবর্তে তিনি নিপতীত হতে থাকেন। তাঁকে নিয়ে এসে এমন এক পরিবারে স্থান করে দেয়া হয় যে, সে পরিবার ছিল গোটা মিসরের মধ্যে সম্মানিত ও মর্যাদাবান এবং ক্ষমতাশালী। যদিও তাকে দাসের মতোই কিনে আনা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সাথে কখনো দাসসূলভ ব্যবহার করা হয়নি।

তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছিল এবং পরিবারের একজন দায়িত্বশীল হিসেবেই দেখা হত। এটা সেই সময়ের ঘটনা যখন তিনি পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। এটা ছিল সেই বয়স, যে বয়সে পা রাখলে একজন কালো কুৎসিত মানুষের রূপ-লাবণ্য সৌন্দর্য তার পাঁপড়ি মেলে দেয়, সমস্ত সৌন্দর্য বিকশিত হয়। রূপ সৌন্দর্যের এমন কোন শাখা ছিল না যেখানে নব-কিশলয় জাগেনি। রূপ মাধুর্য ও কমনীয়তার মূর্ত প্রতীক হিসেবেই তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছিল। চারিত্রিক পবিত্রতা ও লজ্জার ভূষণ তাকে পরম আকর্ষনীয় করে তুলেছিল।

তাঁকে যে ব্যক্তি কিনে নিয়ে নিজ বাড়িতে আপন সন্তানের ন্যায় স্থান দিয়েছিলো, সেই ব্যক্তির স্ত্রী তাঁর প্রতি চরমভাবে আকর্ষিত হয়ে পড়লো। হযরত ইউসুফ

আলায়হিস্ সালামের রূপ-যৌবন সুধা ভোগ করার জন্য সে উন্মাদিনী হয়ে পড়েছিল। ইশারা-ইঙ্গিতে তাঁকে বার বার সে আহ্বান জানাতে থাকে। কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বিকার পাষাণের মতই স্থির-অবিচল। দু'কূল প্লাবী যৌবন সাগরে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করতে চায় যে নারী, সে নারীর হাত ছানিকে তিনি সামান্য পরিমাণ গুরুত্ব দিলেন না। আপন স্রষ্টার প্রেমে যে হৃদয় সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত পরিপূর্ণ থাকে, সে হৃদয়ে কি আর অন্য কারো প্রেম স্থান পেতে পারে!

একজন পুরুষকে আকৃষ্ট করার যতগুলো অস্ত্র থাকতে পারে, তার সবগুলোই সেই নারী প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তার সমস্ত অস্ত্র যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন সে এক চরম পথ অবলম্বন করলো। নিজের ঘরে তাঁকে আহ্বান করে জোর পূর্বক তাঁকে নোংরা কাজে লিপ্ত করার এক হীন পরিবেশ সৃষ্টি করলো।

ঘরের মধ্যে তাঁকে আহ্বান করা হলে তিনি সরল বিশ্বাসে নিত্যদিনের মতোই ঘরে প্রবেশ করলেন। মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করলো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'যে মহিলার ঘরে সে অবস্থান করছিল, সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। একদিন সে ঘরের দরজা বন্ধ করে বললো, এবার তুমি এসো। ইউসুফ বললো, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করি। আমার রব তো আমাকে উত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আমি কি এই কাজ করতে পারি!' (সূরা ইউসুফ-২৩)

আল্লাহর নবী মহিলার খারাপ উদ্দেশ্যে বুঝতে পেরে সেই উন্মাদিনী নারীর কবল হতে আত্মরক্ষা করার জন্য ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি দরজা খুলে বাইরে চলে যাবেন। সেই নারীও ছুটে এসে তাঁর পবিত্র শরীরের জামার পেছনের অংশ খামছে ধরলো। তিনি শক্তি প্রয়োগ করে সেই নারীর কবল হতে মুক্ত হবার জন্য দরজার দিকে ছুটে গেলেন। নারী এমন শক্তভাবে তাঁর জামা ধরেছিল যে, তাঁর শরীরের জামা ছিঁড়ে গেল। তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ছুটে গিয়ে দরোজা খুলে ফেললেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই চরম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি তথা ঐ মহিলার স্বামী এবং তাঁর আত্মীয় ঘরে প্রবেশ করার জন্য আসছিল।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'শেষ পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক ও ইউসুফ আগে পিছে দরোজার দিকে দৌড়ালো। আর সে পেছন হতে ইউসুফের জামা টেনে ধরলো এবং জামা ছিঁড়ে গেল। দরজায় দু'জনই সেই স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দেখতে পেলো। তাকে দেখেই স্ত্রী লোকটি বলতে লাগলো, যেই লোক তোমার গৃহিনীর প্রতি অসৎ ইচ্ছা পোষণ করে তার শাস্তি কি হতে পারে? তাকে কয়েদ করো বা কঠিন শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কি শাস্তি হতে পারে?' (সূরা ইউসুফ-৫)

আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামও গৃহকর্তাকে তার স্ত্রীর অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইউসুফ বললো, এই স্ত্রী লোক আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করছিল। সে স্ত্রী লোকটির নিজ পরিবারবর্গের এক ব্যক্তি ইঙ্গিত সূচক সাক্ষ্য পেশ করলো। বললো, ইউসুফের জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী লোকটি সত্যবাদিনী আর সে মিথ্যুক। আর তাঁর জামা যদি পেছন দিকে ছেঁড়া হয় তাহলে স্ত্রীলোকটি মিথ্যুক ও সে সত্যবাদী। স্বামী যখন দেখলো যে, ইউসুফের জামা পেছন দিকে ছেঁড়া, তখন সে বললো, এ তো তোমাদের স্ত্রীলোকদের ছলনা। আর তোমাদের ছলনা ও কৌশল অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে থাকে। হে ইউসুফ! তুমি এই ব্যাপারটিকে ভুলে যাও। আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের ক্ষমা চাও, আসলে তুমিই ছিলে অপরাধিনী।' (সূরা ইউসুফ-২৬-২৯)

কলঙ্কিনী বধুর কলঙ্ক প্রকাশ

মিথ্যা বেশী দিন টিকে থাকে না। আজ যদি মিথ্যার আবরণে সত্যকে মুড়িয়ে রাখা হয়, সে আবরণ খুলে পড়তে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। মহাসত্য তার আপন প্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক দিয়েছিল যে নারী, সে তার অবৈধ কামনা পূরণ করতে না পেরে কি ধরনের উন্মাদ ও হিংস্র হয়ে উঠেছিল, তা ঘটনা পড়লেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু যখন সে তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলো, তখন সে সমস্ত দোষ হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের প্রতি চাপিয়ে দিল।

এই নারী যে ব্যক্তির স্ত্রী ছিল, সে ঠিকই অনুভব করতে পেরেছিল, প্রকৃত দোষী হলো তাঁরই স্ত্রী। এই যুবক সম্পূর্ণ নির্দোষ। এ কারণে সে ব্যক্তি এই ঘটনাটি গোপন করতে আগ্রহী ছিল। যারা নিজের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন, তাদের জীবনে বা তাদের পরিবারে যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটে, যা তাদের সম্মানের ওপরে আঘাত করতে পারে। তারা সাধারণত সে ঘটনার বিস্তৃতি ঘটতে দেয় না, ঘটনা গোপন করার চেষ্টা করে।

মহিলার স্বামীও তাঁর স্ত্রীর এই কলঙ্ক গোপন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘটনা গোপন থাকেনি। সমাজের অনেকেই এই ঘটনা জেনে গিয়েছিল। ফলে সমাজের লোকজন বিশেষ করে নারী সমাজ তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ মন্তব্য করছিল। এমন কথা তারা বলছিল যে, এত বিশাল ক্ষমতা ও ধন-দৌলত সম্পন্ন একজন ব্যক্তির স্ত্রী হয়ে সে নারী শেষ পর্যন্ত বাড়ির একজন চাকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল?

যারা এই ধরনের মন্তব্য করছিল, তারা সবাই ছিল সে সমাজের উচ্চস্তরের নারীর দল। এ কথা সেই নারীর কান পর্যন্ত যখন পৌঁছলো, তখন সে নিজেকে এই কলঙ্ক হতে মুক্ত হবার জন্য আরেকটি নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করেছিল। সে তদানীন্তন সমাজের অভিজাত ঘরের নারীদেরকে তার বাড়িতে দাওয়াত দিল। তাদের বসার জন্য সে সুবন্দোবস্ত করেছিল। কোরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তাদেরকে এমন ধরনের আসনে বসতে দেয়া হয়েছিল যে, তারা পেছনের দিকে হেলান দিয়ে বসেছিল।

অর্থাৎ বর্তমান কালের সোফাসেট ধরনের কিছু হবে। তাদের সামনে হয়ত টেবিল জাতিয় উচ্চ কোনো আসন ছিল। অথবা মূল্যবান বিছানা বিছিয়ে এমন ধরনের উচ্চ বালিস দেয়া হয়েছিল, যাতে হেলান দিয়ে বসা যায়। মিসরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি হতেও প্রমাণিত হয় যে, সেখানে মজলিসসমূহে প্রচুর পরিমাণে বালিশের ব্যবহার করা হতো।

এই আসনে সবার সামনে খাদ্য পাত্র ছিল। সে খাদ্য পাত্রে নানা ধরনের সুস্বাদু খাদ্য ছিল এবং খাবার গ্রহণ করার জন্য হাত ব্যবহার করার পরিবর্তে বর্তমান কালের কাটা চামচ বা ছুরি দেয়া হয়েছিল। এসব আমন্ত্রিত অতিথি যখন খাদ্য কেটে খাবার গ্রহণ করছিল, তখন সে নারী কৌশল করে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে তাদের সামনে উপস্থিত করেছিল।

আমন্ত্রিত নারী অতিথিগণ আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের ইতোপূর্বে কোনোদিন না দেখা রূপ সৌন্দর্য দেখে এমনই বিমোহিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা তাদের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল। তারা আল্লাহর নবীর চেহারার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু তাদের হাত নীরব ছিল না। হাত ছিল খাদ্য বস্তু কাটায় ব্যস্ত।

আল্লাহর নবীর দীপ্তিমান চেহারার দীপ্তি ও জ্যোতিতে তারা এমনই মোহিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা খাদ্য বস্তুতে ছুরি চালানোর সময় নিজের হাতে ছুরি চালিয়ে হাত কেটে রক্তাক্ত করে ফেলছিল, সেদিকে তাদের চেতনাই ছিল না। এ সময়ে তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতেই বলে উঠেছিল, এ আমরা কি দেখছি! আমরা কি কোনো মানুষকে দেখছি না ফেরেশতাকে দেখছি! মহান আল্লাহর শপথ! এই ব্যক্তি তো কোনো মানুষ নয়! এই মানুষটি সম্পূর্ণ নূরের তৈরী!

এবার কলঙ্কিনী সেই নারী তার অপরাধ ঢাকা দেয়ার জন্য তার নতমাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে বলছিল, এতদিন তোমরা আমাকে বলেছো, আমি চাকরের সাথে

নিজেকে জড়িয়ে ছিলাম। এবার তোমরা তো দেখলে, কেনো আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম? তাঁর এত রূপ, এত সৌন্দর্য যে আমি নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি যেমন তোমরা আজ পারলে না। এই লোকটি যদি তোমাদের বাড়িতে থাকতো, তাহলে তোমারাও আমার মতোই আচরণ করতে বাধ্য হতে।

তোমরা আজ তাকে মাত্র একবার দেখেই নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে গেছো, আর আমি দিনের পর দিন এই মানুষটিকে আমার সামনে বিচরণ করতে দেখছি। আমি কি করে নিজেকে ধরে রাখতে পারি এখন তোমরাই বিচার করে দেখো। তবে হ্যাঁ, সে যদি আমার কামনা বাসনা পূরণ না করে, তাহলে আমি তাকে এমন শাস্তি দেয়ার ব্যবস্থা করবো যে, চিরকাল সে শাস্তির কথা মনে থাকবে। আর না হয় সে এই শাস্তি গ্রহণ করার ভয়ে হয়ত আমার অভিলাষ পূরণ করতে বাধ্য হবে।

এভাবেই সেই কলঙ্কিনী নারী সমাজে তার চরিত্রহীনতার কথা প্রকাশ করলো আর আল্লাহর নবীর নির্দোষীতার প্রমাণ দিতে বাধ্য হলো। এই ঘটনাটিও মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা ইউসূফে বর্ণনা করেছেন।

কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে

নীতি-নৈতিকতা ও আল্লাহ বিরোধী কোনো কাজ নিজের দ্বারা সংঘটিত হবার পূর্বে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এমন স্থানকেই অধিক প্রাধান্য দিবে, যে স্থান সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা আছে যে, সেখানে তাকে চরম কষ্টের মধ্যে দিনরাতের প্রত্যেক মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হবে। সেখানে যতোই কষ্ট হোক না কেনো, এমন কাজ করতে সে ব্যক্তি কখনোই রাজী হবে না, যে কাজ করে মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো যাবে না। এ কারণেই নবী রাসূল ও তাঁদের দৃঢ় অনুসারী ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীগণ প্রজ্জ্বলিত আগুনের কুন্ডকে, কারাগারের অন্ধকার কুঠুরিকে, ফাঁসির রশিকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর সামনে লজ্জিত হতে হবে, এমন কাজ তাঁরা করেননি। অন্যায়ের সামনে তাঁরা কখনো মাথানত করেননি।

এই অবস্থায় নিপতিত হয়ে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর কাছে কি আবেদন করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে, 'ইউসুফ বললো, হে আমার রব! এরা আমার কাছ থেকে যে কাজ পেতে চায় তার তুলনায় কয়েদ হওয়া আমি অধিক পছন্দ করি। তুমি যদি এদের অপকৌশলগুলো আমার ওপর হতে দূরে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়বো ও জাহিলদের মধ্যে গণ্য হবো। তাঁর রব্ব তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং সেই স্ত্রীলোকদের

কূট-কৌশলকে তাঁর কাছ হতে দূরে সরিয়ে দিলেন। নিশ্চিতই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন। তারপর সেখানের লোকজন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখার কথা ভাবলো। অথচ তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা এবং নিজেদের নারী সমাজের অসদাচরণের সুস্পষ্ট প্রমাণ তারা ইতোপূর্বেই দেখতে পেয়েছিল।' (সূরা ইউসুফ-৩৩-৩৫)

নিজের সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করার জন্য হযরত ইউসুফকে নির্দোষ জেনেও সেই ক্ষমতাধর ব্যক্তি স্ত্রীর দাবি অনুসারে আল্লাহর নবীকে কারাগারে বন্দী করলেন। কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুসারে আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই এমনি গ্রেফতার করে জেলে আটক করে রাখা বেঈমান ও স্বৈরাচারী শাসকদের অতি প্রাচীন রীতি। এই ধরনের ঘৃণ্য কাজে বর্তমান যুগের ক্ষমতাশালী লোকজন সেই চার হাজার বছর পূর্বের দুষ্ট শাসকদের তুলনায় আরো বেশী ভয়ঙ্কর। সে যুগের জালিম আর এ যুগের জালিমদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, সে যুগের স্বৈরাচারী শাসকরা গণতন্ত্রের দোহাই দিতো না, আর এ যুগের স্বৈরাচাররা গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে জুলুম করে থাকে।

সে যুগের জালিমরা আইন ছাড়াই বে-আইনী কাজ কর্ম চালাতো আর এরা প্রত্যেকটি জুলুমমূলক কাজের 'বৈধতা' প্রমাণের জন্য পূর্বেই একটি আইন পাশ করে রাখে। তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য সরাসরি মানুষের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালাতো আর এরা যার ওপর হামলা করে, তার সম্পর্কে গোটা দুনিয়াকে এই কথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এই লোকটির দ্বারা তাদের মতো ব্যক্তিরই শুধু নয়, দেশ ও জাতিও এই লোকটির দ্বারা বিপদগ্রস্ত। সে যুগের স্বৈরাচাররা শুধু জালিম ছিল আর এ যুগের জালিমরা স্বৈরাচার ও সেই সাথে চরম মিথ্যাবাদী এবং নির্লজ্জ।

কারাগারের দিনগুলো

ফুল যেখানেই ফোটে তার আপন সৌরভ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ সে ফুলের সৌরভ অনুভব করে। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সে যুগের সুগন্ধ যুক্ত ফুল হিসেবেই শুধু প্রেরণ করেননি, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে সেই ইউসুফ নামক ফুল থেকে সুগন্ধি গ্রহণ করবে। সে ফুল যুগ-যুগান্তরে সৌরভ ছড়াবে। সে ফুল আজ পৃথিবীতে নেই, কিন্তু তাঁর বিখ্যাত সেই সুবাস রয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

তাঁকে কারাগারে বন্দী করা হলো। তাঁর অপরাধ, তিনি কুলটা নারীদের যৌবনের কামনা-বাসনা পূরণ করেননি। তথাকথিত এই অপরাধে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার জন্য আল্লাহর নবীকে তারা বন্দী করেছিল। সে কারাগারের ভেতরেও তিনি নীরবে বসেছিলেন না। কারাকর্তৃপক্ষ ও সমস্ত কারাবন্দীদের কাছে তিনি আকাশের উজ্জ্বল সূর্যের মতই দেখা দিলেন। তাঁর মধ্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে গুণাবলী নিহিত রেখেছিলেন এবং জান্নাতের যে সুবাস দিয়ে দিয়েছিলেন, তা গোটা কারাগারকে আমোদিত করে তুলেছিল।

কারাগারের সমস্ত বন্দী এবং কারাকর্তৃপক্ষের কাছে এক সময় তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎ ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হলেন। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামও তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, একজন মানুষ আরেকজন মানুষের রব বা প্রতিপালক হতে পারে না। প্রতিপালক হলেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত কিছুর স্রষ্টা। কারাগারের বন্দীসহ অন্যান্য লোকজন তাঁর কাছে যে কোনো সমস্যার সমাধান গ্রহণ করতেন। জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য তাঁর কাছেই তারা পরামর্শের জন্য ধর্ণা দিত।

বন্দীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা

এই কারাগারের দুইজন বন্দী ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে তার ব্যাখ্যার জন্য আল্লাহর নবীর কাছে এলেন। একজন বললো, স্বপ্নে আমি দেখলাম যে, আমি মদ তৈরী করছি। আরেকজন জানালো, সে স্বপ্নে দেখেছে, তার মাথার ওপর রুটি রাখা রয়েছে এবং সে রুটি পাখি খাচ্ছে। স্বপ্নের ধরন শুনে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম প্রথমেই তাদেরকে স্বপ্নের অর্থ বললেন না, সর্বপ্রথমে তিনি তাদেরকে একমাত্র মহান আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য দাওয়াত দিলেন। এরপর তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানালেন। পবিত্র কোরআনে সূরা ইউসুফে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি যা বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে তা এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'হে কারাগারের বন্ধুরা! তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই যে, তোমাদের একজন নিজের প্রভু (মিসরঅধিপতি)-কে শরাব পান করাবে। আর আরেকজনকে শূলে চড়ানো হবে। আর পাখি তার মাথার মগজ ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলে, তার ফয়সালা হয়ে গেল।' (সূরা ইউসুফ-৪১)

অর্থাৎ একজন মুক্তি লাভ করবে মিসর অধিপতিকে শরাব পরিবেশনের দায়িত্ব লাভ করবে এবং আরেকজনকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। যে বন্দীটি মুক্তি পাবে, তাকে হযরত

ইউসুফ বলেছিলেন, সে যেনো মিসর অধিপতির কাছে তাঁর বিষয়টি উত্থাপন করে। যেহেতু মিসর অধিপতির জানা ছিলো হযরত ইউসুফ নির্দোষ, তাঁর কাছে বিষয়টি উত্থাপিত হলে তিনি তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বাস্তবেও তা-ই ঘটলো। একজন মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো এবং আরেকজনকে মুক্তি দিয়ে মিসর অধিপতির ব্যক্তিগত খাদেমের চাকরি দেয়া হলো। কিন্তু লোকটি আল্লাহর নবীর বিষয়টি তার প্রভু মিসর অধিপতির কাছে উত্থাপন করতে ভুলে গেলো। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, শয়তান তাকে এমন ভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিলো যে, হযরত ইউসুফের বিষয়টি তার স্মরণেই ছিলো না।

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামকে যখন বন্দী করা হয়, তখন তার বয়স ২০/২১ এর অধিক ছিল না। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি যখন মিসরের শাসক হলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩০ বছর। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে হযরত ইউসুফ প্রায় ১০ বছরের মতো কারাগারে বন্দী ছিলেন। এভাবে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের জীবনের মূল্যবান প্রায় ১০ টি বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পার হয়ে গেছে। কারাগারে তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেননি। ইসলামী আদর্শ কারাকর্তৃপক্ষ এবং বন্দীদের মাঝে প্রচার করেছেন। তাদেরকে আল্লাহর গোলামী করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর যমীনে যারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা এই আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত, তাঁরা যে কোনো অবস্থাতেই থাকুক না কেনো, মুহূর্ত কালের জন্যও তাঁরা তাদের দায়িত্ব থেকে গাফিল হন না।

মিশর অধিপতির স্বপ্ন

মিসরের শাসক একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন দেখে এই স্বপ্নে ব্যাখ্যা জানার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি এক সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে দেশের সমস্ত চিন্তাশীল অধিবাসী, গণৎকার, জ্যোতিষী, ধর্মনেতা ও যাদুকরদের একত্রিত করে তাদের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলছে, ‘একদিন বাদশাহ বললো, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, সাতটি স্বাস্থ্যবান গাভী অপর সাতটি স্বাস্থ্যহীন গাভীকে খাচ্ছে আর সাতটি শস্য গুচ্ছ তরতাজা এবং বাকী সাতটি একেবারে শুকনো। হে দরবারের লোকজন! তোমরা যদি স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারো, তাহলে আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও। দরবারের লোকজন বললো, এ তো অস্পষ্ট স্বপ্নের কথা। আমরা এই ধরনের স্বপ্নের তাৎপর্য বুঝি না।’ (সূরা ইউসুফ-৪৩-৪৪)

বাদশাহের স্বপ্নের কথা শুনে শরাব পরিবেশকের মনে পড়লো কারাগারে বন্দী হযরত ইউসুফের কথা। সে বাদশাহর হযরত ইউসুফের বিষয়টি জানালো এবং কারাগারের মধ্যে তার নিজের ও তার সাথীর স্বপ্নের যে নির্ভূল ও যথার্থ ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন, সে সংবাদও শাসককে জানালো। অবশেষে সে বাদশাহকে বললো, আমাকে কারাগারে তাঁর কাছে যেতে দিন, আমি তাঁর কাছ থেকে এই স্বপ্নেরও ব্যাখ্যা জেনে আসবো। তাকে কারাগারে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের কাছে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এর পরের বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন জানাচ্ছে, 'সেই দুইজন কয়েদীর মধ্যে যে ব্যক্তি জীবিত ছিল, এক দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরে তার স্মরণ হলো এবং বললো, আমি আপনাদেরকে এর তাৎপর্য জানাবো। আমাকে কিছু সময়ের জন্য কারাগারে ইউসুফের কাছে যেতে দিন। সে কারাগারে গিয়ে বললো, হে সত্যপরায়ণতার মহাপ্রতীক ইউসুফ! আমাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যে, সাতটি স্বাস্থ্যবান গাভী অপর সাতটি স্বাস্থ্যহীন গাভীকে খাচ্ছে আর সাতটি শস্য গুচ্ছ তরতাজা এবং বাকী সাতটি একেবারে শুকনো। সম্ভবত আমি সেই লোকদের কাছে ফিরে যাবো এবং সম্ভবত তারা জানতে পারবে।

ইউসুফ বললো, তোমরা সাতটি বছর পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে চাষাবাদ করতে থাকবে। এই সময় যেসব ফসল তোমরা কাটবে তা হতে সামান্য অংশ-যা তোমাদের খোরাকীর জন্য প্রয়োজনীয়-বের করবে আর বাকী সব অংশ এর গুচ্ছের মধ্যেই রেখে দেবে। এরপর সাতটি বছর অত্যন্ত কঠিন আসবে। এই সময়ের জন্য তোমরা যেসব শস্য সঞ্চয় করে রাখবে, তা সবই তখন খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে শুধু তাই, যা তোমরা সংরক্ষিত করে রাখবে। এরপর একটি বছর আবার এমন আসবে যে, যখন রহমতের বর্ষণ দ্বারা লোকদের আবেদন শোনা হবে আর তারা রস নিঙড়িয়ে নিবে।' (সূরা ইউসুফ-৪৫-৪৯)

হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম শুধুমাত্র মিসর শাসকের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যাই বলে দেননি, প্রথম সাত বছরে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে এবং দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা কিভাবে করতে হবে, সে ব্যবস্থার কথাও বলে দিলেন। এবং একই সাথে তিনি দুর্ভিক্ষের পরে যে স্বচ্ছল অবস্থা আসবে, সে আগাম সংবাদও জানিয়ে দিলেন।

সৌভাগ্য শশীর উদয়

মিসরের বাদশাহ সরাসরি হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের মুখে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শোনেননি, সেই শরাব পরিবেশকের মুখে আল্লাহর নবীর দেয়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনলেন। ইতোপূর্বেও তিনি কারাগারে বন্দী এই লোকটি সম্পর্কে অনেক প্রশংসা শুনেছেন এবং বর্তমানে লোক মুখে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা জন্ম সৃষ্টি হলো। তিনি বন্দী লোকটির জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধির গভীরতা উপলব্ধি করলেন। এ জন্য তিনি খুশী হয়ে লোকদের বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।

কিন্তু মিসরের এই শাসকের আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। সে ধারণা করেছিল, একজন সাধারণ বন্দী, আর তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছেন স্বয়ং বাদশাহ। এই আহ্বানকে বন্দী ব্যক্তি নিজের সৌভাগ্য মনে করে তীরবেগে এসে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু তিনি যখন হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে তার দরবারে তলব করলেন, তখন ঘটনা তার ধারণার বিপরীত ঘটলো। আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে মিসর শাসকের আহ্বানে সাড়া দিলেন না। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি রাজ দরবারে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানালেন।

একদিকে তিনি নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য কারাগারের অন্ধকার জীবন বেছে নিয়েছিলেন, দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর যাবৎ মিথ্যা অজুহাতে তাঁকে কারাগারে বন্দী রাখা হলো, এরপরেও তিনি কলঙ্কের কালি মেখে বন্দীদশা থেকে মুক্তি চাইলেন না। তিনি যেমন পবিত্র, তেমনি পবিত্র অবস্থাতেই জনসম্মুখে আসতে আগ্রহী ছিলেন। ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এই আত্মমর্যাদা বোধ সৃষ্টি করতে চায়।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালামের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলছে–বাদশাহ বললো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কিন্তু বাদশাহের প্রেরণ করা লোক যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো তখন ইউসুফ বললো, তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা করো যে, সেই মহিলাদের ব্যাপারটি কি, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? আমার রব কিন্তু তাদের এসব কূট-কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত রয়েছেন। (সূরা ইউসুফ-৫০)

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ তা আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'য়ালা সম্যক অবগত রয়েছে। কিন্তু যে

অভিযোগে আমাকে বন্দী করা হয়েছিলো, সেই অভিযোগ সম্পর্কে মিসর শাসকের তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। অভিযোগের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি সাধারণ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হতে আগ্রহী নই। আমাকে মুক্তি দেবার পূর্বে সাধারণ মানুষকে এ কথা জানাতে হবে যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলাম এবং অকারণে আমাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিলো। প্রকৃত অপরাধ ছিলো তোমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের। তারাই তাদের মহিলাদের অশোভন আচরণের বিষয়টি সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে আমাকে জেলখানায় বন্দী করেছিলো। আল্লাহর নবীর এই দাবী মিসর শাসক মেনে নিতে বাধ্য হলেন এবং নিজেদের মহিলাদের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করলেন। মহিলার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলো যে, ঐ লোকটি ছিলো সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন জানাচ্ছে, 'এরপর বাদশাহ সেই মহিলাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা যখন ইউসুফকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলে, তোমাদের সেই সময়ের অভিজ্ঞাতা কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, আল্লাহ মহান ও পবিত্র! আমরা তো তাঁর মধ্যে অন্যায়ের বিন্দুমাত্র দেখতে পাইনি। আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, এখন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমিই তাকে ভুলাতে চেষ্টা করেছিলাম। নিঃসন্দেহে সে অবশ্যই সাচ্চা ও খাঁটি লোক।' (সূরা ইউসুফ-৫১)

মহিলাদের অকপটে এই স্বীকৃতি ৮/৯ বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে নতুন ও সতেজ করে দিলো। হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালামের ব্যক্তিত্ব এবং সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘ কারাজীবনের কঠিন অবস্থা থেকে বের হয়ে অকস্মাৎ সমাজের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন, মিসরের গোটা রাজন্যবর্গ, সম্মানিত ব্যক্তিবৃন্দ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যেও তাঁর নৈতিক মর্যাদা অতি উচ্চে স্থান লাভ করলো।

কারাগার হতে শাসকের আসনে

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের বিষয়টি শুধুমাত্র তাঁর আশ্রয়দাতার বাড়ির চার দেয়াল বা রাজদরবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। বিষয়টি সারা দেশব্যাপী জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা যে দায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পণ করেছিলেন, তা হলো নবুওয়তির দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্য তাঁকে অবশ্যই সকল মানুষের সম্মুখে যেতে হবে। তিনি মানুষকে আল্লাহর গোলামী করার দিকে আহ্বান জানাবেন।

সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যদি গোটা দেশে একটি খারাপ ধারণা থেকে যেত, তাহলে তিনি যখন মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতেন তখন লোকজন তাকে বলার

সুযোগ পেত যে, তোমাকে আমরা চিনি। অমুকের স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করতে গিয়ে তুমি ধরা পড়ে জেল খেটেছো। আর আজ এসেছো আল্লাহর কথা বলতে। মানুষ যেন এ কথা বলতে না পারে এবং তাঁকে নিষ্পাপ মনে করে তাঁর দাওয়াত কবুল করে, এই জন্য তাঁকে অপবাদ মুক্ত হয়ে সম্মান-মর্যাদার সাথে জেলখানা থকে বের হয়ে আসা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কারাগারের বন্দীদশা থেকে সম্মানের সাথে বের করে এনেই মহান আল্লাহ তাঁকে দেশের শাসকের পদে আসীন করেছিলেন।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে, 'বাদশাহ বললো, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে গ্রহণ করবো। ইউসুফ যখন তাঁর সাথে কথা বললো, সে জানালো, এখন আপনি আমাদের কাছে বড়ই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। আপনার বিশ্বস্ততার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' (সূরা ইউসুফ-৫৪)

মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর প্রিয় বান্দাহকে আত্মমর্যাদার সাথে মিসরের বাদশাহের দরবারে উপস্থিত করালেন। এই অবস্থা সৃষ্টি করার আরেকটি কারণ হলো, আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম যখন মিসর শাসকের সাথে কথা বললেন, তখন মিসর শাসক অত্যন্ত সম্মান-মর্যাদার সাথে তাঁকে জানালেন, 'আপনি আমাদের সকলের কাছে খুবই মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব এবং আপনার প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

দক্ষ রাজনীতিবিদগণ সাধারণত এ ধরনের ভাষাতেই কথা বলে থাকেন। মিসর শাসকও একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর এই কথার মূল উদ্দেশ্যে ছিলো, 'রাষ্ট্রীয় কাজে আপনি যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনাকে আমরা সাথী হিসেবে পেতে ইচ্ছুক এবং আপনাকে যে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন করার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি নেই।'

হযরত ইউসূফ আলাইহিস্ সালামকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য নবুওয়াত দেয়া হয়েছিলো, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে পেলে তা বাস্তবায়ন করা খুবই সহজ হবে, এ বিষয়টি তিনি জানতেন। এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে মাধ্যমে আল্লাহ্র আইন-বিধান জারী করার, মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করার সুযোগ লাভ করবেন । দুনিয়ায় যে জন্য নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়ে থাকেন তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতার মাধ্যমে সেই মহাদায়িত্ব পালনের সুযোগ পাবেন।

এ কারণেই তিনি মিসর শাসকের দেয়া প্রস্তাবের উত্তরে বলেছিলেন, 'ইউসুফ বললো, দেশের অর্থ-ভান্ডার আমার কাছে সোপর্দ করুন। আমি তার সংরক্ষক এবং সর্ব বিষয়ে আমার অবহিতিও আছে।' (সূরা ইউসুফ-৫৫)

এর অর্থ এটা নয় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিসরের অর্থমন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছিলেন। তিনি সারা মিসর রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং যোগ্যতার সাথে আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করে মিসরের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে প্রিয়পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা সারা মিসরে এতটাই ব্যাপক ছিলো যে, মিসরের প্রত্যেক এলাকার জনগণ তাঁকে নিজেদের মধ্যে পাবার জন্য উদগ্রীব ছিলো।

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন, 'এভাবে আমি সেই দেশের ওপর ইউসুফের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিলাম। সে দেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিজের বসবাসের স্থান বানানোর তাঁর পূর্ণ অধিকার ছিল। বস্তুত আমি আমার রহমতের সাহায্যে যাকে চাই ধন্য করি। সাদচারী লোকদের কর্মফল আমার কাছে কখনই নষ্ট হয়না।' (সূরা ইউসুফ-৫৬)

স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, সারা মিসর রাজ্যের ওপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এবং তিনি মিসরের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নিজের বাসস্থান নির্মাণ করতে পারতেন। একজন মানুষ কতটা ক্ষমতাশালী এবং জনপ্রিয় হলে দেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম মিসরের রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে যে বিস্তীর্ণ ভূমিতে ফসল সংরক্ষণ করেছিলেন, তা খুবই উর্বর। ফসল সংরক্ষণের ঐ ভূমি বাংলাদেশের মতো সুজলা-সুফলা উর্বর ভূমিকেও হার মানায়। এই ভূমি দেখতে দেখতে আমরা মিসরের ফাইউম শহরের সীমান্তে পৌঁছে গেলাম।

আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম মসজিদে

ফাইউম বর্ডারে পৌঁছুলে চেকপোষ্ট থেকে আমাদের পরিচয় জেনে ৬ জন পুলিশসহ একটি গাড়ি আমাদের নিরাপত্তার জন্য সাথে দিয়ে দিলো। ফাইউম শহরের একটি সুদৃশ্য বিশাল মসজিদে আমরা সালাতুল জুমআ আদায় করলাম। ফেরার পথে পুলিশদের খাবার জন্য গাইড আব্দুল কাদেরকে কিছু অর্থ দিতে বললাম। পুলিশ কিছুতেই অর্থ নিলো না। তারা বিনয়ের সাথে বললো, 'এটা আমাদের দায়িত্ব, আমরা দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র।' আমরা সাথে করে কিছু বিস্কুট এনেছিলাম, সে বিস্কুটের এক প্যাকেট দিতে বললাম। তারা তা গ্রহণ করে শুকরিয়া আদায় করলো।

দুপুর তিনটার সময় ফিরে এলাম কায়রো শহরের আব্বাসিয়া এলাকায় আমাদের থাকার সেই ধূষর রঙের বাড়িটিতে। আল আযহারে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রদের

বেশ কয়েকজন আমাদেরকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে ওপরে নিয়ে গেলো। দুপুরের খাওয়া শেষ করলাম। সেই ফজরের পর বেরিয়েছি, একটানা কয়েক ঘন্টা সফরের কারণে ক্লান্তিতে দুচোখ ভেঙে ঘুম আসছিলো। নির্ধারিত রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আসরের সময় ঘুম থেকে জেগে নামায আদায় করে উপস্থিত সকলের সাথে নানা বিষয়ে আলাপ করতে করতে মাগরিবের সময় ঘনিয়ে এলো। মাগরিবের নামায আদায় করে হাল্কা নাস্তা শেষে পুনরায় বেরিয়ে পড়লাম। এ সময়ে আমাদের সফর তালিকায় ছিলো হযরত আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদ দেখা ও নীলনদে ভ্রমণ করা। সে অনুযায়ী প্রথমেই আমরা যাত্রা করলাম আফ্রিকা মহাদেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত মসজিদে আমর ইবনুল আ'স-এর দিকে।

কায়রো শহরে সালাউদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)-এর দূর্গের সামান্য দূরেই এই মসজিদ। প্রশস্ত রাস্তার পাশেই একটু নীচু অবস্থানে মসজিদটি অবস্থিত। খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ১৩ হিজরীতে সিরিয়ার বিভিন্ন দিকে বাহিনী প্রেরণ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনামলেই হযরত আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে ওমান এলাকার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আমরের কাছে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'আল্লাহর রাসূল আপনাকে ওমানের ওয়ালী নিযুক্ত করেছিলেন, এ জন্যই আমি আপনাকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম। এখন আমি আপনার ওপর দায়িত্ব অর্পন করতে ইচ্ছুক, এতে আপনার পৃথিবী ও আখিরাতে কল্যাণ হবে।'

খলীফার এই পত্রের জবাবে হযরত আমর লিখলেন, 'আমি তো মহান আল্লাহর একটি তীর। আর আপনি হলেন সে তীরের একজন দক্ষ তীরন্দাজ। সুতরাং যেদিকে খুশী আপনি সেদিকেই এই তীর নিক্ষেপ করার অধিকার আপনার রয়েছে।'

এরপর প্রথম খলীফা তাঁকে ওমান থেকে সরিয়ে ফিলিস্তিন এলাকায় প্রেরণ করেন। সিরিয়া বিজয় করে তিনি মিসরে অভিযান চালানোর জন্য দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তিনি ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী এবং সে কারণেই মিসরে তাঁর যাতায়াত ছিলো। ফলে মিসর সম্পর্কে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞদের মধ্যে একজন। দ্বিতীয় খলীফা প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করলেও পরে তাঁকে মিসর অভিযানে অনুমতি দেন। হযরত আমর ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়ে মিসরের পথে রওয়ানা হলে খলীফা হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে আরেকটি সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করেন।

হযরত আমর বাবুল ইউন, আরীশ, আইনু শাম্স বা ফুসতাত ইত্যাদি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এরপর তিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হবার জন্য দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর অনুমতি কামনা করেন। খলীফা অনুমতি প্রদান করলে তিনি বিজিত এলাকার দায়িত্ব হযরত খারিজা ইবনে হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ওপর ন্যস্ত করে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন। সে সময় মিসরের শাসক ছিলেন মুকাউকাস। এই ব্যক্তির কাছে ইতোপূর্বেই ইসলামের দাওয়াত পৌছেছিলো কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

চেহারা দেখেই আতঙ্কিত

মিসর অধিপতি মুকাউকাসের দরবারে হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নেতৃত্বে মুসলমানরা উপস্থিত হয়েছিলো। হযরত উবাদা ছিলেন ঘোর কালো বর্ণের, দীর্ঘাঙ্গ ও বিশাল আকৃতির মানুষ। প্রথম দর্শনেই শত্রুপক্ষের সমস্ত দেহে ভয় আর আতঙ্কের শিহরণ বয়ে যেতো। কিন্তু ইসলাম তাঁকে উচ্চতর মর্যাদার আসনে আসীন করেছিলো। ইসলামের দাওয়াত দানকারী দলের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি মিসর শাসক মুকাউকাসের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে দেখেই মুকাউকাস ভয়ে-আতঙ্কে কম্পিত হয়ে উঠেছিলো। সে আতঙ্কে চিৎকার করে বলেছিলো, 'এই ভয়াবহ কালো ও বিশালদেহী লোকটিকে আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে নাও এবং অন্য কাউকে তাঁর স্থানে প্রেরণ করো।'

প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যদের একজন মিসর অধিপতি মুকাউকাসকে লক্ষ্য করে বললেন. 'তাঁকে সরানো যাবে না, তিনিই আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম অভিমত দানকারী ও জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। তিনিই সর্বাধিক কল্যাণময়, সম্মান-মর্যাদার দিক থেকে আমাদের মধ্যে সকলের তুলনায় অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, অগ্রবর্তী ও সর্বাধিক আল্লাহভীরু।'

মিসর শাসক মুকাউকাস কথা বলতে বাধ্য হলেন কৃষ্ণকালো বিশালদেহী হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে। হযরত উবাদা মিসর শাসকের সম্মুখে বক্তৃতায় বললেন, 'হে মিসরের শাসক! আমি আপনার কথা শুনেছি। আমি আপনার সম্মুখে আমার এক সহস্র সাথির প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলতে এসেছি। আমার পেছনে যারা রয়ে গিয়েছে, তাঁরা আমারই মতো বা আমার থেকেও অধিক কালো বর্ণের। দেখতে আমার তুলনায় অধিক ভয়াবহ। আপনি যদি

তাদের দেখেন তাহলে আমাকে দেখে যতটা আতঙ্কিত হয়েছেন, তার থেকেও বেশী ভয় পাবেন। আমাকেই দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়েছে। আমার সাথি জওয়ানদের ব্যবস্থপনা ও পরিচালনা আমিই করে থাকি। কিন্তু মহান আল্লাহর প্রশংসা, আমার শত্রুপক্ষের ১০০ শত জনকেও আমি সামান্যতম ভয় পাইনা– যদি কখনো তারা যুদ্ধের ময়দানে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। আমার সকল সাথিও আমারই মতো নির্ভীক বীর সেনানী।'

পিন্ পতন নীরবতার মধ্য দিয়ে মিসর সম্রাট মুকাউকাস ও তার দরবারের লোকজন হযরত উবাদার বক্তৃতা শুনছিলেন। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে হযরত উবাদা পুনরায় জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলতে থাকলেন, 'আমরা নির্ভীক বীর সেনানী এ কারণে যে, আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থে এখানে আসিনি বা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়িনা। আমাদের একমাত্র কাজ হলো মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে পরকালীন জীবনে সফলতা লাভ করা। আমরা যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা লড়াই করি, তাদের সাথে ব্যক্তিগত কারণে কোনো শত্রুতা পোষণ করি না। পৃথিবীর কোনো বস্তুগত স্বার্থ লাভের জন্য আমাদের এ যুদ্ধের লক্ষ্য নয়। আমরা শুধু এটুকুই গ্রহণ করি, যতটা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের জন্য বৈধ করেছেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ যদি স্বর্ণের বিশাল বিশাল পর্বতও লাভ করে, তাহলে তা সবই মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পথে– তাঁদের আনুগত্যের পথে ব্যয় করে দেই।'

হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কথা শেষ হবার পরেও ভয়ে-আতঙ্কে মিসর অধিপতির কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ উচ্চারিত হয়নি। বেশ কিছুক্ষন পরে তিনি তাঁর দরবারের লোকদের দিকে তাকিয়ে শুষ্ককণ্ঠে বলেছিলেন, 'এই বিশালদেহী লোকটি যা বললো, তোমরা কি এ ধরনের কথা কখনো শুনেছো? আমি এই লোকটির গায়ের বর্ণ আর বিশাল দেহ দেখেই ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর কথা আমার কাছে তাঁর গায়ের বর্ণ আর ভয়াবহ চেহারার তুলনায় অধিক ভীতিজনক। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই লোক ও তাঁর সাথিরা অচিরেই সমগ্র পৃথিবী বিজয় করবে।'

হযরত আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যখন মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করলেন, তখন মিসর শাসক মুকাউকাসের বাহিনী ও শহরবাসী সুরক্ষিত কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলো। এরা হঠাৎ করেই কিল্লার বাইরে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পুনরায়

কিল্লার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতো। এভাবে প্রায় দুই বছর অতিক্রম হতেই দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উদ্বিগ্ন হয়ে হযরত আমরকে এক পত্রে লিখলেন, 'দুই বছর ধরে আপনি অবরোধ করে বসে রয়েছেন। কেনো ধরনের ফলাফল দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে রোমানদের মতো আপনারাও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে গিয়েছেন। আমার এই পত্র যখন আপনার হাতে পৌছবে, তখনই আপনি মুসলমানদের সমাবেশ আহ্বান করে জিহাদ সম্পর্কে নসিহত করবেন। তারপর জুমআর দিনে শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ করবেন।'

খলীফার নির্দেশ অনুসরণ করে হযরত আমর শত্রু বাহিনীর ওপর আক্রমণ পরিচালনা করে আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া ইবনে খাদীজকে মদীনায় খলীফার কাছে বিজয় সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ সংবাদে খুশী হয়ে হযরত আমরকে মিসরের গভর্ণর নিয়োগ করেন। তাঁর সন্তান একবার এক মিসরীয়কে বেত্রাঘাত করে এবং নিজের পিতা ও দাদা সম্পর্কে গর্ব প্রকাশ করেছিলো। এ সংবাদ মদীনায় খলীফার কাছে পৌছলে তিনি উক্ত মিসরীয়কে অভিযুক্ত থেকে এর বদলা নেবার নির্দেশ দেন এবং আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বলেছিলেন, তোমরা কবে থেকে লোকদের গোলাম বানিয়ে নিয়েছো, অথচ তাদের মায়েরা স্বাধীন অবস্থায় তাদের জন্ম দিয়েছিলো। (ইবনুল জওযী-তারিখে ওমর উবনুল খাত্তাব)

ইতোমধ্যে হযরত ওমর শাহাদাতবরণ করলে তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুও তাঁকে পূর্ববর্তী পদে বহাল রাখেন। এ সময়ে রোমের উস্কানীতে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা বিদ্রোহ করলে তিনি সে বিদ্রোহ দমন করেন এবং এই শহরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙ্গে দেন, যেনো ভবিষ্যতে আর কেউ বিদ্রোহ করার সাহস না পায়।

হযরত আমর মিসর বিজয় করে ২১ হিজরী মোতাবেক ৬৪২ খৃষ্টাব্দে এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং ফুসতাত নামক স্থানে একটি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রও স্থাপন করেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০০০ হাজের অধিক শিক্ষার্থী ছিলো। হযরত আমর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে তাঁরই নামে- মসজিদে আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু। তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁরই পুত্র আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ইমামতিতে জানাযা আদায় করে মিসরের মাকতাম নামক স্থানে দাফন করা হয়।

প্রথমে প্রায় ১৫০০ বর্গ হাত জায়গার ওপর এটি স্থাপিত হয়। এই মসজিদে তখন মিনার ছিলো না, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর নির্দেশে মিসরের পরবর্তী গভর্ণর হযরত মুসলিমা ইবনে মুখাল্লাদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সর্বপ্রথম আযান দেয়ার জন্য মিসরে তদানীন্তন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কুটনীতিক হযরত আমর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদে মিনার নির্মাণ করেন।

পরবর্তীতে মিসরের বাদশাহ আব্দুল আযিয ইবনে মারওয়ান ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে মসজিদটি আরো বর্ধিত করা হয়। এরপর মিসরের যুবরাজ ক্বোরাহ ইবনে শওরাইক আল আবসী ৭১১ খৃষ্টাব্দে মসজিদটির সংস্কার সাধন করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে খলীফা আল ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের নির্দেশে কারুকার্য মন্ডিত কাঠের একটি মিম্বর নির্মাণ করা হয় এবং চারটি স্তম্ভে স্বর্ণের প্রলেপ দিয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়। এই মসজিদে পূর্বদিকে চারটি, পশ্চিমদিকে চারটি, উত্তরদিকে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। খলীফা আল মামুনের নির্দেশে মিসরের শাসক আব্দুল্লাহ ইবনে তাহির ৮২৭ খৃষ্টাব্দে মসজিদের উত্তর পাশে মসজিদটিকে বর্ধিত করেন। বর্ধিত করার পরে মসজিদটির পরিমাপ দাঁড়ায় ১৩, ৫৫৬,২৫ বর্গ মিটার। এই মসজিদের মধ্যে সাদা মার্বেল পাথরের ১৫০ টি স্তম্ভ রয়েছে এবং মিনার রয়েছে তিনটি।

এই মসজিদ নির্মাণের পূর্বে কিবলা নির্ধারণের কাজে ৮০ জন সম্মানীত সাহাবায়ে কেরাম শামিল ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম, হযরত উবাদা ইবনুস সামিত, হযরত আব্দুদ দারদা এবং হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদের প্রথম ইমাম ছিলেন হযরত আমর স্বয়ং এবং হযরত আবু মুসলিম ইয়াফেয়ী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন প্রথম মুয়াজ্জিন। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে এই মসজিদেই বিচার বিভাগের কাজ সম্পন্ন করা হতো এবং এখানে নানা বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হতো।

মসজিদের প্রথম কাতারের বামদিকে হযরত আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর মাযার রয়েছে। মসজিদের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি কাঠের মিম্বর আছে এবং মাঝের খোলা চত্বরটি সম্পর্ণ মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়ানো। প্রথম থেকেই এই মসজিদে সম্মানিত বুযুর্গানে দ্বীন, ওলামায়ে কেরাম ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ নামায আদায় করে আসছেন এবং তাদের সাথে এই মসজিদটির রয়েছে আত্মিক সম্পর্ক। বর্তমান

ইমামের নাম শায়েখ জিব্‌রাঈল। প্রত্যেক রমজান মাসে তিনি এখানে নামায আদায় করান। ২৬ শে রমজানের রাতে এই মসজিদে নামাযীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ লক্ষেরও অধিক। বর্তমানে এই মসজিদটি দেখতে মদীনার মসজিদে নববীর অনুরূপ। আমরা এখানে দুই রাকাআত নফল নামায আদায় করে প্রাণভরে দোয়া করলাম।

মিসরের নীলনদ

মিসর নামক দেশটির প্রধান ভৌগোলিক বিশেষত্ব হলো নীলনদ। প্রাচীনকালে এবং বর্তমানেও মিসরের প্রধান অবলম্বন হলো এই নীলনদ। এই নদী আসওয়ান বা প্রথম জলপ্রপাত পর্যন্ত নাব্য। নীলনদের ব-দ্বীপে অসংখ্য শাখা নদী রয়েছে। এসব নদীর মধ্যে রসেট্টা ও ডামিয়েট্টা সবথেকে বড়। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীগুলোর অন্যতম হলো এই নীলনদ, এর একাধিক উৎসের মধ্যে আফ্রিকার বুরুন্ডির উচ্চভূমিতে ট্যাঙানিকা হ্রদের উত্তরে কাগেরা নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে ভিক্টোরিয়া হ্রদে পতিত হয়েছে। এটি উগান্ডার ভিক্টোরিয়া হ্রদের উত্তর তীরের জিঞ্জা থেকে শুরু হয়েছে।

নীলনদ প্রায় ৪,১১৫ মাইল আফ্রিকার নয়টি দেশের বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা, তাঞ্জানিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, জেইরী, সুদান, ইথিওপিয়া ও মিসরের মধ্যে ১, ১৫০, ০০০ বর্গমাইল খাতে দক্ষিণে পানি সংগ্রহ করে ৯৩৫ মাইল উত্তর মুখে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। বর্তমান মরুভূমি তখনকার অপ্রবেশ্য অরণ্য এই নীলনদ তীরবর্তী অঞ্চলেই ৫০০০ হাজার বছর পূর্বে মিসরীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়। এই নদীর কোনো শাখা বা উপনদী মিসরে নেই।

আদি মিসরীয়রা নীলনদের বন্যার পানির উপযুক্ত ব্যবহার রপ্ত করেছিলো। বন্যার পানি নেমে গেলে যে পলিমাটি জমে থাকতো, তার ওপর তারা নানা ধরনের শস্য ও পশুখাদ্য-ঘাস উৎপন্ন করতো। নীলনদের এই বন্যার কারণেই খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মিসরের প্রভূত উন্নতি ও লাঙ্গলের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এসব কারণেই গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাস এই দেশকে নীলনদের দান বলে অভিহিত করেছেন। নীলনদীতে বন্যার কারণেই শস্য উৎপাদন ও পশুচারণের জন্য সেচ ব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং এখানে এমন এক সভ্যতার সৃষ্টি হয় যা মানুষের আদি উন্নয়নের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

সুদূর দক্ষিণ থেকে প্রবাহিত হয়ে আসার পথে নীলনদের এই পানির ধারা পর্বতের শৈলশিরায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু কালক্রমে এই নদী প্রবাহ ঐ শৈলশিলাসমূহ ভেঙ্গে সমুদ্র পথে যাত্রা অব্যাহত রাখে। এই পাহাড়ী প্রতিবন্ধকতাকে বলা হয় জলপ্রপাত।

নীলনদের পানির ধারা এ ধরনের ৬ টি জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। কায়রোর নীচে নীলনদের পশ্চিমে ফাইউম নামে এক উর্বর নীচু মরুদ্যান রয়েছে। এই মরুদ্যানে নীলনদের সাথে যুক্ত একটি খাল থেকে পানি সরবরাহ করা হয়।

নীলনদের সলিলে ভাসমান বোটে

হযরত আমর ইবনুল আ'স মসজিদ থেকে বের হয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম নীলনদের এক পোর্টে যেখানে ইঞ্জিন চালিত সুন্দর সুন্দর বোট রয়েছে। নীলনদের ইতিহাস ইতোপূর্বেই বর্ণনা করেছি। পৃথিবীর যেসব প্রাচীন নদী-কেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে নীলনদ তার অন্যতম। মিসরের সৌন্দর্যই এই নীলনদ। মরুভূমির দেশে এই নদীই পৃথিবীর পর্যটকদের মূল আকর্ষণ এবং এদেশের অধিবাসীদের জীবনের উৎস এই নদী।

এই নদীর পাড়ে বেশ কয়েকটি স্থানে সুন্দর সুন্দর পোর্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এসব পোর্টে ছোট-বড় নানা আকৃতি ও রঙের বহু সংখ্যক বোট, লঞ্চ এবং অন্যান্য ভাসমান যান-বাহন রয়েছে। বিলাস-বহুল ভ্রমণের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় ভাসমান হোটেল ও রেস্তোরা, দামী নৌবহর এবং প্রমোদতরী। এগুলোতে রয়েছে ফাইভ বা থ্রী-স্টার মানের হোটেল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লবি-লাউঞ্জ, রেস্টুরেন্ট, শয্যা কক্ষ বা স্যুট, লাইব্রেরী, নাইট ক্লাব, বার, ব্যায়ামাগার, সুইমিং পুল, ডাইনিং হল রুম, খেলা-ধূলার স্থান ইত্যাদি। ভাসমান এসব হোটেলের প্রত্যেক রাতের ভাড়া ৩ থেকে ৬ শত মার্কিন ডলার। এসব হোটেলে সবথেকে বেশী ভীড় জমে খৃষ্টানদের খৃষ্টমাসের বড় দিনের ছুটির সময়।

অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন, আরকান উল্লাহ হারুনী, গাইড আব্দুল কাদেরসহ আমরা মোট ৬ জন মিসরীয় ৬০ পাউন্ডের বিনিময়ে একটি ইঞ্জিন চালিত বোট এক ঘন্টার জন্য ভাড়া করলাম। বোটে উঠে বসতেই ইঞ্জিন স্বশব্দে গর্জন করে উঠলো। বোট এগিয়ে চললো নদীর গভীরে। বোটটি মধ্যম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। নীলনদের দুই তীর সুন্দরভাবে বাঁধানো। এই নদী কায়রো শহরকে দুইভাগে ভাগ করেছে, এ জন্য এর ওপর রয়েছে অনেকগুলো সেতু।

নদীর দুই পাশে নয়নাভিরাম আলোকসজ্জা সুদৃশ্য স্থাপনাসমূহ দেখে এটিএন বাংলার ইসলামী অনুষ্ঠান মালার পরিচালক আরকান উল্লাহ হারুনী লোভ সামলাতে পারলো না। ওর হাতের ক্যামেরা সচল হয়ে উঠলো। মাঝে মধ্যেই ক্লিক, ক্লিক শব্দ আর আলোর ঝলকানী- হারুনী মিসরের এসব দৃশ্য একাধারে ক্যামেরা বন্দী করে চলেছে।

আমি নীলনদের দুই পাশের স্থাপনা দেখছি। কোথাও কোনো বিশৃংখলা বা অসামঞ্জস্য কিছু নেই। যেখানে যেমন করে সাজালে দৃশ্য সুন্দর হবে এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করা যাবে, সেখানে সেভাবেই সাজানো হয়েছে। মিসর সরকার এই নীলনদ দেখিয়েই বছরে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এ কারণে এই নদীকে সুন্দর রাখার জন্য যা করা প্রয়োজন, তাই করা হয়েছে এবং এদেশের প্রত্যেক নাগরিক যেনো এই নদীকে চির যৌবনা রাখার জন্য সচেষ্ট। এই নদীর দুই পাশে নদী থেকে বেশ দূরে নানা ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান সুপরিকল্পিতভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থ নদীতে নয়– অন্যত্র ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নদীর দুই পাশে কতক স্থানে নানা ধরনের ফসলের ক্ষেত, এসব ক্ষেতে ভুট্টা, টমেটো, আলু, লেবু ইত্যাদি উৎপন্ন করা হচ্ছে এবং আরবের অন্যান্য দেশে তা রফতানীও করা হচ্ছে। মিসরকে বলা হয় 'নীলনদের দান' বাস্তবে না দেখলে এ কথাটির মর্ম উপলব্ধি করা যাবে না। এই নদীর নীচ দিয়ে রয়েছে টিউব লাইন আর ওপর দিয়ে রয়েছে বহু সংখ্যক ব্রিজ। এই নদী লন্ডনের টেমস্ নদীর মতোই স্রোতস্বিনী।

নীলনদের দুই পাশের দৃষ্টি নন্দন এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই আমার মন চলে গিয়েছিলো আমার সোনার দেশ– বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীসহ অন্যান্য এলাকার নদীর বুকে। এসব নদীর দুই পাশ অবৈধ দখলদাররা দখল করে বসত বাড়িসহ নানা ধরনের কল-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। ফলে নদীগুলো নাব্যতা হারিয়ে ক্রমশ বিলীন হবার পথে ধাবিত হয়েছে। কল-কাখানার ভয়াবহ বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য নদীতে ফেলার কারণে জলজ প্রাণীগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। মাছের দেশ নামে পরিচিত বাংলাদেশ মাছ শূন্য হতে চলেছে। বিষাক্ত বর্জ্য মিশ্রিত এই পানিতে যারা গোসল করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের দেহে নানা ধরনের দুরারোগ্য চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে। স্থলচর ও উভচর যেসব প্রাণী এই পানি পান করছে, তারাও সজীবতা হারিয়ে ফেলছে। সর্বোপরি বিষাক্ত এই পানির কারণে জমির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট হচ্ছে।

এই কাজ যারা করছে, তারা দেশের সহজ-সরল জনগন নয়, এদের মধ্যে অধিকাংশই হলো বড় রাজনৈতিক দলের হোমরা-চোমড়া। ক্ষমতার প্রভাবে বা অর্থের বিনিময়ে এসব লোক সরকারী জমি, নদীর দুই পাড় ও জলাশয়গুলো দখল করে এসব স্থানের অপব্যবহার করে দেশকে ক্রমশ পিছনের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। ফলে বৃষ্টি বা বন্যার কারণে শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে আর এ কারণেই দেশের রাজধানী ঢাকা ক্রমশ বসবাসের অযোগ্য শহরে পরিণত হচ্ছে।

সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রতিহিংসা পরায়ণ রাজনীতিবিদগণ এবং তাদের প্রতিহিংসার ঘৃণ্য রাজনীতি। এই প্রতিহিংসার রাজনীতিই আমাদের দেশকে ঘুনের মতো একটু একটু করে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে– দেশ ক্রমশ ধাবিত হচ্ছে ধ্বংসের দিকে। আমার দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদদের অবস্থা সেই হ্যামিলনের বংশী বাদকের মতোই। কেউ একজন তাদের সম্মুখে বংশী বাজিয়ে চলেছে, আর তারা সেই বাঁশির ঐন্দ্রজালিক সুরের মূর্ছনায় সম্মোহিত হয়ে নিশ্চিত ধ্বংস গহ্বরের দিকেই দেশকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মতপার্থক্য ভুলে দেশকে গড়ার কোনো চিন্তা এরা ঘুমের রাজ্যে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না।

ভারতের মতো বিশাল দেশ নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলো মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। সিকিম, ভুটান, নেপাল ও কাশ্মিরের ব্যাপারে ভারতের সকল রাজনৈতিক দলগুলো একই সুরে কথা বলে। ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্যে মতপার্থক্যের বিশাল ফাটল থাকার পরও নিজেদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ মতামত প্রকাশ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিশ্বের মানচিত্রে আমাদের মতো ক্ষুদ্র দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক করে বা উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলো পৃথক করে দেশদ্রোহী কেনো অশুভ শক্তি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী করে, তখন দেশের কোনো কোনো রাজনৈতিক দল তাদের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে।

আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারতেন না, নীলনদ ও টেমস্ নদীর মতো বুড়িগঙ্গা নদীর দুই পাশে সুপরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে নদীটির বৈধব্য বেশ ঘুচিয়ে বুড়িগঙ্গাকে যুবতী গঙ্গায় পরণিত করতে? এই নদীর প্রতি যথাযথভাবে যদি যত্ন নেয়া হতো, তাহলে বিদেশী অসংখ্য পর্যটক রাজধানী ঢাকা শহরে ভীড় জমাতো। পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুললে আমাদের দেশের রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই, টেকনাফ, পতেঙ্গা, কক্সবাজার হতে পারতো আরো সুন্দর, আকর্ষণীয় এবং নিরাপত্তাপূর্ণ স্থান।

এসব স্থান হতে পারতো আমাদের দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যম। কিন্তু বর্তমানে বিদেশী পর্যটক তো দূরে থাক, স্থানীয় লোকজনই এসব স্থানে নিরাপত্তার অভাবে নিশ্চিন্ত মনে ভ্রমণ করতে পারে না। নিজ দেশের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ অনুভব করলাম বোট স্থির– ইঞ্জিন থেমে গিয়েছে। চিন্তায় ছেদ পড়লো– সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখি, যেখান থেকে উঠেছিলাম সেখানেই বোট এসে থেমে গিয়েছে। এক ঘন্টা মানে ৬০ মিনিট কোথা দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে বুঝতেই পারিনি।

তুরে সাইনার পথে

গতরাতে নীলনদ ভ্রমণের সময় নদীর আরামদায়ক বাতাস দেহ-মনে এক ধরনের প্রশান্তি এনে দিয়েছিলো। ফলে অন্যান্য দিনের তুলনায় গত রাতে একটু তাড়াতাড়িই বিছানায় যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজ শনিবার, ০৯/০৪/২০০৫ তারিখ। ফজরের নামায আদায় করে একটু ঘুমিয়ে নাস্তা সেরে দ্রুত প্রস্তুত হলাম। আজ আমাদের যেতে হবে অনেক অনেক দূরে, আজকের সফর সূচীর মধ্যে অন্যতম হলো তুরে সাইনা এলাকা পরিদর্শন। পবিত্র কোরআনের সূরা ত্রিশতম পারায় সূরা আত্ তীন-এর দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা তুরে সাইনার কথা উল্লেখ করেছেন। তুর পর্বতের নামে পবিত্র কোরআনে একটি স্বতন্ত্র সূরাই অবতীর্ণ হয়েছে। ক্রমিক নং অনুসারে পবিত্র কোরআনের সেটি ৫২ নং সূরা এবং সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা আত তুর।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা তীন-এর দ্বিতীয় আয়াতে 'সিনিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সাইনা' হলো সীনীন উপদ্বীপেরই আরেকটি নাম। একে 'সাইনা, সীনা বা সীনীন'ও বলা হয়। তবে পবিত্র কোরআনের একে 'তুরে সাইনা'ই বলা হয়েছে। যে এলাকায় তুর পর্বত অবস্থিত এবং বর্তমানে তা 'সীনা' নামেই পরিচিত। আমরা আমাদের এই সফরনামায় পবিত্র কোরআনে ব্যবহৃত নামই ব্যবহার করবো। এই পর্বতের নামে মহান আল্লাহ শপথ করেছেন, এখানে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের জীবনে সংঘটিত নানা ঘটনা ঘুরে ফিরে এসেছে। এখানেই তিনি মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন এবং এখানেই তাঁকে নবুওয়াত দান করা হয়েছিলো। এ ছাড়াও অন্যান্য নবীদের কেন্দ্র করেও এখানে নানা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং তাঁদের মাযারও এখানে রয়েছে। এই স্থানটি মুসলিম, খৃষ্টান ও ইয়াহূদীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের গাইড আব্দুল কাদের সকাল সকাল এসে হাজির হলো। ড্রাইভার আব্দুর রউফ আজকে আরেকজন ডাইভার সাথে এনেছে। এদেশের নিয়ম হলো, ৩৫০ কিলোমিটারের অধিক রাস্তা যেতে হলে ড্রাইভার দুইজন থাকতে হবে। এ ব্যবস্থা আমার কাছে যুক্তিভিক্তিকই মনে হলো। একজন ড্রাইভার থাকলে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার সময় সে অসুস্থও হয়ে যেতে পারে অথবা দীর্ঘক্ষণ গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে অবসাদ গ্রস্থ হয়ে দূর্ঘটনাও ঘটিয়ে বসতে পারে। তাছাড়া আরোহী ও খোদ ড্রাইভারের নিরাপত্তার দিক থেকেও নিয়মটি খুবই ভালো। দ্রুত বাসা থেকে বের

হয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। যান-বাহনে আরোহণ কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দোয়া পাঠ করতেন, তা পাঠ করছি, ইতোমধ্যে গাড়ির ইঞ্জিন গর্জন করে উঠলো।

তুরে সাইনা বা জবলে মূসা আলাইহিস্ সালাম মিসরের রাজধানী শহর কায়রো থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গাড়ি কায়রো শহরের কোলাহল মুখর পরিবেশ থেকে বের হয়ে নির্জন মরুভূমির পথ ধরলো। আজ মনের মধ্যে এক অদ্ভূত অনুভূতি অনুভব করছিলাম। জীবনের এই প্রথম সেখানে যাচ্ছি, যেখানে এই মহাবিশ্বের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের সাথে কথা বলে তাঁকে ধন্য করেছিলেন।

কায়রো থেকে ফাইউম যাবার সময় রাস্তার দুই পাশে দৃষ্টি নন্দন দৃশ্য সবুজের সমারোহ হাতছানি দিয়েছিলো, তুরে সাইনা যাবার পথে রুক্ষ বালি ছাড়া আর কিছুই নেই। পেছনের দিকে তাকালে অপসৃয়মান কায়রো শহর চোখে পড়ে, তবুও ক্রমশ তা ঝাপসা হয়ে আসছে। কিন্তু ডানে, বামে ও সম্মুখের দিকে তাকালে দিগন্ত বিস্তৃত মরুপ্রান্তর ব্যতীত আর কিছুই চোখে পড়ছে না। চারদিকে তামাটে রঙের বালি সকালের সোনালী রোদে চিক্ চিক্ করছে। প্রকৃতির অগণিত সৌন্দর্যের মধ্যে এ আরেক সৌন্দর্য।

মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত হলে ক্যাকটাস প্রজাতির এক ধরনের গাছ বালি ভেদ করে গজিয়ে ওঠে। এই গাছের আঠা নীচে পড়ে বালির সাথে মিশ্রিত হলেই বালি সোনালী রঙের মন্ড আকার ধারণ করে। হঠাৎ কেউ দেখলে বা না জানার কারণে বালির সেই মন্ডটিকে স্বর্ণপিন্ড বলে ধারণা করে ছুটে যায়। কিন্তু মন্ডটি ধরার সাথে সাথে তা পুনরায় গুড়ো বালিতেই পরিণত হয়।

মরুভূমি নির্জন হলেও তা প্রাণী শূন্য নয়। এখানে অসংখ্য পোকা-মাকড় রয়েছে। মধ্যম আকৃতির এক ধরনের বিষাক্ত সাপ রয়েছে এই মরুভূমিতে। বালির রঙ ও সাপের রঙ পৃথক করে চেনার উপায় থাকে না। এরা শিকার আসার পথে বালির ওপর নিজের শরীর কাঁপাতে থাকে। ফলে ক্রমশ এরা বালির নিচে চলে যায় এবং শুধুমাত্র মুখটি ওপরের দিকে রাখে। শিকার নাগালের মধ্যে এলেই ওরা ছোবল দিয়ে ধরে খায়। মরুভূমির প্রাণী এক ধরনের বিষাক্ত মাকড়সাও ঠিক একই কৌশলে শিকার ধরে খায়।

আমি অবাক বিস্ময়ে মরুপ্রান্তরে নির্মিত বিশাল বিস্তৃত ও মসৃণ রাস্তা দেখছি। অত্যন্ত যত্নের সাথে নির্মাণ করা হয়েছে এই রাস্তা। তামাটে রঙের বালির বুক চিরে নির্মিত হয়েছে পীচ্‌ঢালা এই কালো পথ– যা সুয়েজ খাল অতিক্রম করে চলে গিয়েছে তুরে সাইনার দিকে। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, এই রাস্তা নির্মাণকালে কোনো ধরনের ভেজাল উপাদানের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়নি, যা আমাদের দেশে নির্মাণ কাজে নিয়মে পরিণত হয়েছে। নির্মাণ কাজে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ না করার কারণে বা ভেজাল উপাদানে নির্মিত ইমারত নির্মাণ করার সামান্য কিছু দিনের ব্যবধানেই বেশ কয়েকটি ইমারত ধ্বসে পড়ে প্রাণহানীর মতো মর্মান্তিক ঘটনা আমাদের দেশে ঘটেছে। আর ভেজাল উপাদানে নির্মিত রাস্তা-পথগুলো নির্মাণ করার কিছুদিন পরেই কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়।

পানির নীচের পথে

মরুভূমির মধ্যে নির্মিত পথ বেয়ে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পরে হঠাৎ করেই ধুমকেতুর মতো সম্মুখে উদিত হলো সুয়েজ খাল। সুয়েজ খাল পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীন খালগুলোর অন্যতম। এই খাল সর্বপ্রথম কে খনন করেছিলো, এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, এই খাল খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিসরীয় শাসক প্রথম 'সেতী বা দ্বিতীয় রামসীস'-এর শাসনামলে নীলনদের সাথে লোহিত সাগরের সংযোগ সাধনের জন্য খনন করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে তা দীর্ঘ এক হাজার বছর খালটি অবহেলায় পড়েছিলো। এরপরে বিভিন্ন শাসকদের শাসনামলে এটি অনেকবার খনন করে পরিবর্ধন করা হয়েছে। লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে সংযোগ সাধনকৃত বর্তমান খালটি বৃটিশদের দ্বারা প্রথম খনন শুরু হয়েছিলো ১৮৫৯ সালের ২৫ শে এপ্রিল। দীর্ঘ দশ বছরে খনন কাজ শেষ করে এটি নৌ পরিবহনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় ১৮৬৯ সালের ১৭ই নভম্বরে। সে সময়ে খনন কাজে ব্যয় হয়েছিলো সর্বমোট ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই অঞ্চলের লোকদের কাছেই সুয়েজ খালের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উন্নয়নের সাথে রয়েছে এর গভীর সম্পর্ক। ইউরোপের দেশসমূহ এ পথেই মধ্যপ্রাচ্যের তেল-ভান্ডার নিয়ে যায় এবং তাদের দেশে উৎপাদিত পণ্য এশীয় বাজারে সরবরাহ করে। সুয়েজ খাল তাদের জন্য এই দুটো কাজ খুবই সহজ করে দিয়েছে। অপরদিকে এশীয়বাসী ইউরোপ থেকে তাদের আমদানী করা পণ্য খুবই সহজে এই খাল ব্যবহার করে নিজেদের দেশে নিয়ে আসছে।

প্রায় ১৬৩ কিলোমিটার দীর্ঘ খালটির প্রশস্ততা কোথাও ২৫০ মিটার আবার কোথাও ১৮০ মিটার। এর তলদেশের প্রশস্ততা সর্বনিম্ন ৬০ মিটার বা প্রায় ১৯৭ ফুট। এই খালের কারণেই দুই সপ্তাহের দীর্ঘ সমুদ্র পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে মাত্র ১৫ ঘন্টার পথে পরিণত হয়েছে। এই খাল না থাকলে ইউরোপের জাহাজগুলো সম্পূর্ণ আফ্রিকা ঘুরে তারপর এশিয়ায় প্রবেশ করতে হতো এবং এশিয়ার জাহাজগুলোও সহজে ইউরোপে প্রবেশ করতে পারতো না। বর্তমানে লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে যাওয়ার পথে সুয়েজ খাল অতিক্রম করতে একটি জাহাজের ১২ থেকে ১৫ ঘন্টা সময় প্রয়োজন হয়।

এই খালে জাহাজ চলাচলের সময় যেনো দুর্ঘটনা না ঘটে, এ জন্য একটি জাহাজকে আরেকটি জাহাজ থেকে ২৩ মিনিট পথের দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়। কোনো জাহাজ সুয়েজ খালে প্রবেশে করার সময় সেই জাহাজে চারজন মিসরীয় গাইড বা পরিচালক থাকবেন, সুয়েজ খাল অতিক্রম না করা পর্যন্ত তাঁরা সেই জাহাজে থাকবেন। মিসর সরকারের প্রধান দুটো আয়ের উৎসের একটি হলো পর্যটন আর অন্যটি হলো সুয়েজ খাল। এই খালে প্রবেশের সময় ছোট-বড় সকল জাহাজকে ১৫০০ শত মার্কিন ডলার কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করতে হয়। প্রত্যহ শত শত পণ্যবাহী জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে সামরিক বাহিনীর প্রহরায় যাতায়াত করে থাকে।

লক্ষ্য করলাম, সুয়েজ খালের পাড়ে কতক স্থানে খেজুরসহ অন্যান্য গাছ লাগিয়ে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই খালের নীচ দিয়ে তৈরী সড়ক পথটিকে 'সুয়েজ ট্যানেল বা আহ্মাদ হামদী ট্যানেল' বলা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া ইসলাম বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের ফসল ইসরাঈলের সাথে মিসরের যুদ্ধের সময় আহ্মাদ হামদী নামক একজন বিশিষ্ট আর্মি মেজর শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে সুয়েজ ট্যানেলটির নামকরণ করা হয়েছে। দুইদিকে আধা কিলোমিটার করে এক কিলোমিটার এবং পানির নীচের অংশে প্রায় তিন কিলোমিটার দুই লেন বিশিষ্ট সড়ক পথসহ ট্যানেলটি চার কিলোমিটার দীর্ঘ।

ট্যানেলের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশের সুযোগ নেই, কারণ পানির ২৫ মিটার নীচ দিয়ে তৈরী ট্যানেলে চলে যান-বাহন আর ওপর দিয়ে চলে জলযান। এ কারণে সবসময় এই ট্যানেলের ভিতরে সোডিয়াম ও হ্যালোজেন বাতির আলো ট্যানেলটির মধ্যে দিনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যথাযথভাবে বায়ূ চলাচলের জন্য রয়েছে বিশাল বিশাল এগ্জোস্ট ফ্র্যান। ট্যানেলের সার্বক্ষণিক অবস্থা ও নিরাপত্তা মনিটরিংয়ের জন্য

এর ভিতরে ২৪ টি ক্লোজ সার্কিট ভিডিও ক্যামেরা বসানো রয়েছে। নিরাপত্তার প্রশ্নে বা যানজট এড়াতে ট্যানেলের মধ্যে গাড়ি থামানোর নিয়ম নেই এবং নির্দিষ্ট করে দেয়া ৫০ কিলোমিটারের নীচে গাড়ি চালানো যাবে না।

কিছুটা ব্যবধান রেখে লাগানো হয়েছে সাইনবোর্ড, এসব সাইনবোর্ডে উৎকীর্ণ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সতর্ক বাণী। সড়কের দুই পাশে প্রায় ছয় ফুট উঁচুতে গ্রীল দিয়ে ঘেরা পায়ে চলার পথ রয়েছে, এ পথ শুধুমাত্র ট্যানেল রক্ষাণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত লোকদের ব্যবহারের জন্যই। সোজাসুজিভাবে খালের নীচ দিয়ে ট্যানেলটি তৈরী করা হয়েছে যা এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের মিলন সেতু হিসেবে কাজ করছে এবং সম্পূর্ণ খালটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর এক প্রান্ত স্পর্শ করেছে লোহিত সাগর এবং প্রান্ত স্পর্শ করেছে ভূমধ্যসাগর।

সুয়েজ খালের দুই তীরে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। হঠাৎ অনুভব করলাম গাড়ি ক্রমশ নীচের দিকে নামছে– যেমন অনুভব হয় কেনো উঁচু স্থান থেকে নীচের দিকে নামার সময়। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালাম গাইড আব্দুল কাদেরের দিকে। সে জানালো, আমরা এখন সুয়েজ খালের নীচে ট্যানেলে প্রবেশ করছি। লক্ষ্য করলাম রাস্তার দুই পাশে বাঁধ দিয়ে উঁচু করা হয়েছে। সুয়েজ ট্যানেল অতিক্রম করতে সময় লাগলো মাত্র দুই মিনিট।

ট্যানেলের ওপারে

মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে অন্য কেনো মুসলিম দেশে নদী বা বড় ধরনের খালের তলদেশ দিয়ে কোনো ট্যানেল বা যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে কিনা আমার জানা নেই। ব্যতিক্রম শুধু হযরত ইউসুফ ও মূসা আলাইহিস্ সালামের দেশ মিসর। শুধুমাত্র এই দুইজন নবী-রাসূলের কথাই বা বলি কেনো, আরো অনেক নবীর পবিত্র পদধূলিতে ধন্য হয়েছে মিসরের মাটি। শুধু নবী-রাসূলগণই নন– পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনার পর মিসর এবং ইরাক হলো সেই দেশ, যেখানে সবচেয়ে বেশী নবী-রাসূল এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও শ্রেষ্ঠ ইসলামী ব্যক্তিত্বদের পদরেণু স্পর্শ করেছে উল্লেখিত দেশ দুটোর মাটি। এই দেশ দুটোর বিভিন্ন স্থানে রয়েছে তাঁদের মাযার।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে এই দুটো দেশেই কোরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহকদের ওপরে চলেছে ইতিহাসের বর্বর নির্যাতন। ইরাক দেশটিকে তো বর্তমানে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা

বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল আমেরিকা কসাইখানায় পরিণত করেছে, আর মিসরও আমেরিকার পুতুলে পরিণত হয়েছে। অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের রক্ষার জন্য আমেরিকার আঙ্গুলী হেলনে মিসরের শাসকগোষ্ঠী নিন্দনীয় ভূমিকা পালন করছে। দুনিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠী অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় সবথেকে নাজুক পরিস্থিতি অতিক্রম করছে। সারা দুনিয়ায় 'মুসলিম' শব্দটিকে একটি মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত করার এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মুসলিম শাসকদের জিহাদী ভূমিকা পালন করা ছিলো সময়ের দাবী, শাসকগোষ্ঠী সে ভূমিকা থেকে দূরে– অনেক দূরে অবস্থান করে ভোগ-বিলাসে মত্ত রয়েছে।

দুর্ভাগা মুসলমান! কি নেই এদের কাছে! আল্লাহ তা'য়ালা জনবল দিয়েছেন, তৈলসহ নানা ধরনের খনিজ সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। বিশাল বিশাল ভূখন্ড দান করেছেন, এ কথায় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দান করেছেন। কিন্তু নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য এসব সম্পদ তারা ব্যবহার না করে ঐসব দুশমনদের হাতেই এসব সম্পদ তুলে দিচ্ছেন, যারা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে মুসলিম নিধন যজ্ঞে নিয়োজিত রয়েছে। মুসলিম শাসকদের অবস্থা চিন্তা করলেই আমার মনে পড়ে সেই কিশোর বয়সে পড়া 'কুড়াল ও কাঠুরিয়া' গল্পের কথা। কুড়াল দিয়ে কাঠুরিয়া গাছ কাটছে। কুড়ালের কাছে গাছ করুণ মিনতি করছে, 'ভাই, তুমি আমাকে কেনো কাঠছো!' কুড়াল বলছে, 'ভাই গাছ! আমি তো তোমাকে কাটছি না, আমার পেছনে যে গোল ছিদ্র রয়েছে, সেই ছিদ্রে তোমারই একটি অংশ প্রবেশ করিয়ে হাতল বানানো হয়েছে। কাঠুরিয়া সেই হাতল ব্যবহার করেই তোমাকে কাটছে। তোমাকে দিয়েই তোমাকে ধ্বংস করা হচ্ছে।'

বর্তমানে বিশ্বে মুসলমানদের এই করুণ পরিস্থিতির বিষয়টি চিন্তা করলেই আমার মনে পড়ে সেই হাদীসটির কথা। হযরত ছাওবান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের কাছে এমন একটি সময় আসবে, যখন দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি তাদের দিকে এমনভাবে ধাবিত হবে, যেমন ধাবিত হয় ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের দিকে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন কি আমরা সংখ্যায় খুবই নগণ্য থাকবো যে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলার জন্য অগ্রসর হবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– না, বরং সেদিন তোমাদের সংখ্যা অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে বন্যার পানির ফেনা সমতুল্য। অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা

সেদিন তোমাদের মনে তাদের ভয় সৃষ্টি করে দিবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর হাবীব! আমাদের মনে এ দুর্বলতা ও ভীতি দেখা দেয়ার কারণ কি হবে? তিনি বললেন, যেহেতু সেদিন তোমরা দুনিয়াকে ভালোবাসবে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করবে। (আবু দাউদ)

এই হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এমন একটি সময় আসবে, যখন পৃথিবীতে মুসলিম নামে পরিচিত লোকের সংখ্যা হবে অগণিত। কিন্তু তাদের ঈমানী শক্তি থাকবে না, তারা পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দিবে। ইসলামের শত্রুদের আনুগত্য করে হলেও ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। ইসলামের দুশমনরা সংখ্যায় অল্প হলেও তারাই মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন করবে, মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। কারণ, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে অবতীর্ণ হয়ে শাহাদাতবরণ করাকে মুসলমানরা পসন্দ করবে না। দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে এমনভাবে মত্ত হয়ে থাকবে যে, তাদের চোখের সামনে অন্য মুসলিম নারী, শিশু, কিশোর, তরুণ-যুবক, বৃদ্ধ দুশমনদের হাতে লাঞ্ছিত-অপমানিত ও অত্যাচারিত হতে থাকবে, কিন্তু তারা মৌখিক প্রতিবাদও করবে না। মুসলমানরা নিজের যাবতীয় সহায়-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, শক্তি-মত্তা ইসলামের দুশমনদের অধীন করে দিবে। নিজেদের অর্থ-সম্পদ শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে শত্রুকে পরাজিত করার মন-মানসিকতা মুসলমানদের থাকবে না, যদিও তারা সংখ্যায় হবে বিপুল।

সুয়েজ খালের এই ট্যানেল দেখে আমার মনে পড়লো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের সেই তরুণ বয়সের কথা। তাঁকে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইগণ পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে একটি কূপে নিক্ষেপ করলো। সেই কূপটি যেনো তাঁর জন্য একটি ট্যানেলে পরিণত হলো। ট্যানেলের একপ্রান্তে মৃত্যুকূপ আরেক প্রান্তে রাজ সিংহাসন। কূপ থেকেই তিনি মিসরে আনীত হলেন এবং পরবর্তীতে সারা মিসর রাজ্যের শাসকে পরিণত হলেন।

দিগন্ত প্রসারিত পানির চাদর

সুয়েজ খাল থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে লোহিত সাগর। এই সাগরের পাড় দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে প্রশস্ত পীচ্‌ঢালা পথ– যে পথ গিয়েছে তুরে সাইনার দিকে। কিন্তু সাগর পাড়ের এই পথে আসতে হলে সুয়েজ খাল পার হয়ে মরুভূমির মধ্য দিয়ে যে সোজা পথ এসে এই পথে মিলিত হয়েছে, সেই পথেই আসতে হবে। সোজা পথ বেয়ে গাড়ি যখন এসে সাগর পাড়ের পথে মিলিত হয়, তার পূর্বে গাড়ির আরোহীর

মনে হবে, গাড়ি বুঝি সাগরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। অনেকটা আমার দেশে সড়ক পথে কক্সবাজারে প্রবেশ করার দৃশ্যের মতো। সম্মুখের পথ যে ডান দিকে বেঁকে মূল শহরে প্রবেশ করেছে, তা গাড়ির আরোহীর চোখে সহজে পড়ে না। মনে হবে গাড়ি এই বুঝি বঙ্গপোসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

আমার গ্রন্থসমূহের অনুলেখক আব্দুস সালাম মিতুল প্রথম যেদিন কক্সবাজারে আমার সাথে এসেছিলো, সেদিন কক্সবাজারের প্রবেশ পথে এই দৃশ্য দেখে আমার গাড়ির ড্রাইভারের নাম উচ্চারণ করে কিছুটা যেনো আতঙ্কেই বলে উঠেছিলো, 'জাহাঙ্গীর ভাই! গাড়ি দেখি সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে!' ড্রাইভার ওকে আশ্বস্ত করে বলেছিলো, 'ডান দিকেই রাস্তা আছে।'

সুয়েজ খাল পার হয়ে দূর থেকে যখন লোহিত সাগর চোখে পড়ে, তখন মনে হয় প্রকৃতি যেনো আগত অতিথিদের স্বাগত জানানোর জন্য দিগন্ত প্রসারিত পানির চাদর বিছিয়ে রেখেছে। পেছনে ফেলে আসা সেই মরুভূমির মতোই সম্মুখে শুধু পানি আর পানি। এখানে দাঁড়ালে মনে হবে, এটা পৃথিবীর একটি প্রান্ত– যা শেষ হয়েছে পানির এই কিনারায়। সম্মুখে অথৈ জলরাশি, কোনো কূল-কিনারা নেই। ওপারে যে কি রয়েছে তা জানারও কোনো উপায় নেই। মাঝে মধ্যে মৃদু সমীরণে সাগরের জলরাশিতে হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে, রোদের আলোয় পানির হিল্লোল রৌপ্যের মতোই ঝিলমিল করে উঠছে।

এই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রয়েছি, মহান আল্লাহ তা'য়ালার রুচিবোধ যে কত বিশাল তা পরিমাপ করা যাবে না। যেখানে যা দিয়ে সাজালে সুন্দর হবে, তিনি এই পৃথিবীকে সেভাবেই সাজিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই–যিনি গোটা জাহানের রব। তাঁর শৈল্পিক জ্ঞান, তাঁর দৃষ্টি-নন্দন সৃষ্টি তাঁরই অনুগত চিন্তাশীল বান্দাদেরকে সিজ্‌দায় অবনত হতে বাধ্য করে। তিনি যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, সবকিছুর ভেতরেই সৌন্দর্য বিদ্যমান। আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বলোকে কোথাও একঘেয়েমি ও বৈচিত্রহীনতা নেই। সর্বত্রই বৈচিত্র দেখা যায়। একই মাটি ও একই পানি থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হচ্ছে।

একই গাছের দুটো ফলের বর্ণ, বাহ্যিক কাঠামো ও স্বাদ এক নয়। পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে তার ভেতরে নানা রংয়ের সমাহার। পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বস্তুগত গঠনপ্রণালীতে অদ্ভূত ধরনের পার্থক্য বিরাজমান। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একই জনক-জননীর দুটো সন্তানও একই ধরনের হয় না। পৃথিবীতে

শতকোটি মানুষ, একজনের সাথে আরেকজনের চেহারার কোন মিল নেই। স্বভাবগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। সৃষ্টির এই বৈচিত্র ও বিরোধই স্পষ্ট করে আঙ্গুলি সংকেত করছে, এ সৃষ্টিজগতকে কোন মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানী বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞতা সহকারে সৃষ্টি করেছেন এবং এর নির্মাতা একজন দৃষ্টান্তহীন স্রষ্টা ও তুলনাবিহীন নির্মাণ কৌশলী।

সে অতুলনীয় নির্মাণ কৌশলী একই জিনিসের শুধুমাত্র একটি নমুনা জ্ঞানের জগতে ধারণ করে সৃষ্টি কাজ সম্পাদনে আদেশ দেননি। বরং তাঁর জ্ঞানের দর্পণে প্রতিটি জিনিসের জন্য একের পর এক এবং অসংখ্য ও সীমাহীন নমুনা, প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত রয়েছে। বিশেষ করে মানবিক স্বভাব, প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বৈচিত্র সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে যে কোন ব্যক্তি এ কথা অনুভব করতে সক্ষম যে, সৃষ্টির এই নিপুণতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং প্রকৃতপক্ষে অতুলনীয় সৃষ্টি জ্ঞান-কুশলতার প্রকাশ্য নিদর্শন। যদি জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষকে তাদের নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক প্রবৃত্তি ও কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁক-প্রবণতা এবং চিন্তা-চেতনার দিক দিয়ে এক করে দেয়া হতো, কোন প্রকার বৈষম্য-বিভিন্নতার কোন পার্থক্য রাখা না হতো, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের মতো একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি প্রতিষ্ঠিত করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো।

মহান আল্লাহ্ পৃথিবীকে নানাভাবে সজ্জিত করেছেন। পৃথিবীর ছাদ হিসাবে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। যমীনকে গালিচার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর স্থলভাগকে শুধু শুষ্ক মাটি আর বালির মরুভূমি বানিয়ে তিনি শ্রীহীন করেননি। সৌন্দর্যের এক অপূর্ব লীলাভূমিতে পরিণত করেছেন। কোনোটি আল্লাহ তা'য়ালা অপূর্ণ রাখেননি। গোটা পৃথিবীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। সমুদ্র সৃষ্টি করে তার ভেতরে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেছেন। সমুদ্র নিশ্চল থাকলে তা দেখতে অসুন্দর মনে হতো। এ জন্য আল্লাহ্ সমুদ্রের বুকে ঢেউ সৃষ্টি করে পানিতে তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা দৃষ্টি-নন্দন করেছেন। পানির ভেতরে মাছ সৃষ্টি করেছেন। আকাশে কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকলে তা দেখতে কুৎসিত দেখাতো। আল্লাহ্ তা'য়ালা সে আকাশ সুন্দর করে সাজিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা এই বিশ্বলোককে অন্ধকারময় ও নিঃশব্দ নিষ্প্রভ করে সৃষ্টি করেননি। আকাশে তারকামালা ও নক্ষত্রপুঞ্জ দিয়ে অত্যন্ত মনোহর; উজ্জ্বল উদ্ভাসিত ও সুসজ্জিত করেছেন। মহান আল্লাহর রুচিবোধ, তাঁর সৌন্দর্যবোধ; সৃষ্টির ভেতরে তাঁর শৈল্পিক জ্ঞানের প্রকাশ দেখলেই অনুমান করা যায় তিনি কত সুন্দর। প্রতিটি সৃষ্টির ভেতরেই তাঁর অকল্পনীয় উন্নত রুচির প্রকাশ ঘটেছে।

আল্লাহর রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, শৈল্পিক নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ কত যে বিস্ময়কর; কত যে প্রশংসামূলক, তা দেখে যেমন হতবাক হতে হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা করেও শেষ করা যাবে না। ফুলসমূহের চলৎশক্তি নেই; তারা চলাফেরার মাধ্যমে একটি আরেকটির সাথে গিয়ে মিলিত হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বাতাসের মাধ্যমে, পানির মাধ্যমে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমর, মৌমাছি ও সুদর্শন দৃষ্টি-নন্দন প্রজাপতির মাধ্যমে ফুলের পুরুষ কেশরকে স্ত্রী কেশরের সাথে মিলিত হবার ব্যবস্থা করেছেন। এই কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব মহান আল্লাহ্ সর্বভূক প্রাণী আরশোলা-তেলাপোকাকে দেননি। কারণ তাঁর বান্দারা এই ফুলের সৌরভ গ্রহণ করে, ফুল দেখতে সুন্দর আর এ জন্য ফুলের ওপর বিচরণ করে সে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন দৃষ্টি নান্দনিক প্রজাপতির ওপরে এবং মৌমাছি আর ভ্রমরের ওপরে।

কি অপূর্বদর্শন এই ভ্রমর আর প্রজাপতি। এদেরকে দেখলে মনে হয় যেন কোন এক নিপুণ শিল্পী দীর্ঘদিন সাধনা করে তার দেহে অপূর্ব সৌন্দর্যের পশরা অঙ্কন করেছে। শত সহস্র প্রজাপতি; একটি প্রজাতির সাথে আরেকটি প্রজাতির রংয়ের কোন মিল নেই। আল্লাহ্ সুন্দর এবং ফুলও সুন্দর, এই সুন্দর ফুলগুলোর ওপরে কুৎসিত দর্শন এবং নোংরা কোন প্রাণী বিচরণ করে পরাগায়ন ঘটালে সৌন্দর্য ও রুচিবোধ ক্ষুন্ন হতো। ফুলের সৌন্দর্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহান আল্লাহ অপূর্ব সুন্দর প্রজাপতিকেই নির্বাচিত করেছেন, তারা গোটা বিশ্বব্যাপী পরাগায়ন ঘটাবে। মহান আল্লাহর রুচিবোধ যে কত সুন্দর, কত মার্জিত ও উন্নত রুচি, তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ ঘটেছে।

আল্লাহকে কেউ যদি চিনতে চায়, কেউ যদি তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হতে চায়, তাহলে তাকে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির অপূর্ব সৌন্দর্য আর সামঞ্জস্যতা দেখে মুখ থেকে নিজের অজান্তেই উচ্চারিত হতে থাকবে-আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন-সমস্ত প্রশংশা একমাত্র আল্লাহর জন্য-যিনি গোটা জাহানের রব।

পৃথিবীর সমস্ত ফলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, এমন কোন একটি ফলও পাওয়া যাবে না, যে ফলের ওপরে আবরণ নেই। সমস্ত ফলের ওপরে আবরণ রয়েছে। মনে হয় যেন মানুষ আল্লাহর সম্মানিত মেহমান, আর মেহমানের সামনে তিনি খাদ্যগুলো পরিবেশন করছেন অত্যন্ত যত্নের সাথে। আবরণহীন ফলের ওপরে

নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ বসবে; তারা মলমূত্র ত্যাগ করবে, ফলগুলো রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে এবং তা খেতে রুচি হবে না। এ জন্য আল্লাহ তা'য়ালা প্রতিটি ফলের ওপরেই আবরণ সৃষ্টি করেছেন। যেন ফলের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে এবং খেতেও রুচিতে না বাধে।

একটি বেদানার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, বেদানার দানাগুলোর ওপরে বেশ কয়েকটি আবরণ রয়েছে। ওপরের আবরণটি সবচেয়ে ঘন আর মোটা। তারপরের আবরণগুলো পাতলা। এগুলো ছিন্ন করার পরেই রসে ভরা দানাগুলো বের হবে। নারিকেলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, তার প্রথম আবরণটি খোসার আকারে বিদ্যমান এবং সেটা খুবই মোটা। এরপর রয়েছে একটি খোলা জাতিয় শক্ত আবরণ। এসব ছিন্ন করার পরই পাওয়া যাবে সুস্বাদু নারিকেল আর শরবত। ছোট্ট একটি ফল আঙ্গুর, তার ওপরেও আবরণ রয়েছে। চালের ওপরেও রয়েছে অনেকগুলো আবরণ। এসব সৃষ্টির সাথে কতটা উন্নত রুচি জড়িত, তা সৃষ্টির ধরণ দেখলেই অনুমান করা যেতে পারে।

সত্যের অনুসারী সত্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সম্পন্ন একজন মানুষ নিখিল বিশ্বের অনু-পরমাণু থেকে শুরু করে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে ঐ বিশাল আকাশ পর্যন্ত এবং বৃক্ষ-তরু-লতা, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর ও বৈচিত্রপূর্ণ প্রাণীজগতের অপূর্ব গঠন প্রণালী তার দৃষ্টির সামনে দেখতে পায়, তখন তার মুখ থেকে নিজের অগোচরেই বেরিয়ে আসে-আল হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন-সমস্ত প্রশংসা একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব।

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হলো, তারা সৃষ্টির এই অপরূপ দর্শনে আত্মহারা হয়ে ওঠে। নারীর সৌন্দর্য অবলোকনে অস্থির চিত্তে তারা কবিতা রচনা করে। প্রজাপতির রঙ দেখে মুগ্ধ হয়ে তারা প্রশংসামূলক গীত রচনা করে। আকাশের নীল রঙ, সাগরের তরঙ্গমালা, বনানীতে বাতাসের হিন্দোল, দূরনিহারিকা কুঞ্জের পলায়নপর আলো, শশধরের মায়াবী কিরণ, দক্ষিণা মলয় সমিরণ, ফুলের মন-মাতানো সৌরভ আর পাখির কলকাকলীতে মুগ্ধ হয়ে অসংখ্য প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে।

কিন্তু এসবের যিনি মূল স্রষ্টা, যিনি পাখির কণ্ঠে গান দিয়েছেন, অরণ্যের মাঝে যিনি সবুজাভা দান করেছেন, সাগর তরঙ্গে যিনি রজত শুভ্র কিরীট দান করেছেন, নক্ষত্রপুঞ্জে যিনি আলোর দ্যুতি সৃষ্টি করেছেন, চাঁদের মাঝে যিনি স্নিগ্ধ কিরণ দিয়েছেন, সমিরণ মাঝে যিনি প্রশান্তির স্পর্শ-আবেশ সৃষ্টি করেছেন, ফুলের

পাঁপড়ীকে যিনি মাধুরী আর সুষমামন্ডিত করেছেন তাঁর প্রশংসা করতে ভুলে যায়। সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশংসায় কোন কার্পণ্য নেই, কিন্তু স্রষ্টার প্রশংসায় জিহ্বায় জড়তা নেমে আসে। সুতরাং, আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্য দর্শন করে যারা তাঁর প্রশংসা করতে কার্পণ্য করে, তারা নিকৃষ্ট রুচি আর হীন মানসিকতারই পরিচয় দিয়ে থাকে। কতই না হতভাগ্য এরা!

জবলে মূসার পাদদেশে

লোহিত সাগরের বেলাভূমি দিয়ে নির্মিত হয়েছে পাকা রাস্তা। এই পথ বেয়ে আমরা চলেছি আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে। পথের যেনো আর ঠিকানা নেই, চলেছি তো চলেইছি। পথে মাঝে মধ্যে চেকপোষ্টের মুখোমুখি হচ্ছি, সাথিদের মধ্য থেকে চেকপোষ্টে নিয়োজিত লোকদেরকে জানাচ্ছে, 'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্য মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেব তুরে সাইনা এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছেন' পরিচয় পেয়ে তারা হাসিমুখে পথ ছেড়ে দিচ্ছেন। বেশ কিছুদূর যাবার পরে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলাম।

সামনে ছোট-বড় পর্বত শ্রেণী, গিরিপথে নির্মাণ করা হয়েছে পাকা রাস্তা। পথের দুই পাশেই নানা ধরনের পাহাড়। এই গিরিপথেরও যেনো শেষ নেই। পর্বত শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে সোজা পথ নির্মাণ করা সহজ নয়– এ কারণে মাঝে মধ্যেই ডানে বামে মোড় নিতে হচ্ছে আমাদের দেশের সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সড়ক পথে যেতে যেমন মোড় নিতে হয়। পথ চলার এক ঘেয়েমি দূর করার জন্য অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন মাঝে মধ্যেই হাম্‌দ-না'ত গেয়ে উঠছেন, তাঁর কণ্ঠ থেমে যেতেই আমাদের সাথে নিয়ে আসা সাইমুম শিল্পী গোষ্ঠীর গানের ক্যাসেট বেজে উঠছে। হঠাৎ কানে এলো নাক ডাকার শব্দ।

প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্য না দেখে কে নাক ডেকে ঘুমায়! পেছনের সীটের দিকে তাকিয়ে দেখি আরকান উল্লাহ হারুনী সীটের পেছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ইতোপূর্বে আমি কখনো ঘুমন্ত হারুনীকে দেখিনি– আজই প্রথম দেখলাম। কালো শ্মশ্রুমন্ডিত বুদ্ধিদীপ্ত গৌর বর্ণের চেহারা জুড়ে ক্লান্তির ছাপ। ওর দিকে তাকিয়ে মনের মধ্যে ওর জন্য গভীর স্নেহের পরশ অনুভব করলাম। ওরই প্রচেষ্টায় বর্তমানে এটিএন বাংলা টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত অসংখ্য বাংলা ভাষাভাষি মানুষ ইসলামী অনুষ্ঠান যেমন দেখতে পায়, তেমনি কোরআন-হাদীসের তাফসীরও শুনতে পায়।

সাইমুমের গান, কখনো অধ্যাপক গিয়াসের স্বকণ্ঠে হাম্দ'না'ত কখনো বা হারুনীর নাকের পাঁচ মিশালী আওয়াজ শুনতে শুনতে চলেছি আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের স্মৃতি বিজড়িত সিনাইয়ের তুর পর্বতের দিকে। যাত্রা বিরতিসহ প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টা চলার পরে অবশেষে এসে জবলে মূসা বা তুরে সিনাই পৌঁছলাম।

কায়রো শহর থেকে বের হয়ে এই অবধি পর্যন্ত আসার পথের সমস্ত দৃশ্য আমি রোমন্থন করলাম। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কথা চিন্তা করে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। তিনি কিভাবে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মাদায়েন এলাকায় পৌঁছে ছিলেন! আমাদের মতো তিনি কায়রো থেকে এদিকে আসেননি, তিনি যখন মিসর থেকে হিজরত করেছিলেন, তখন কায়রো নগরী গড়ে ওঠেনি। সে সময় মিসরের রাজধানী ছিলো মেম্ফিস। সেখান থেকেই তিনি একাকী, পায়ে হেঁটে বিস্তীর্ণ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে, পাহাড়ের বিপদ সঙ্কুল পথ অনাহারে অর্ধাহারে অতিক্রম করে চরম কষ্টে মাদায়েন এলাকায় পৌঁছে ছিলেন।

এই সেই তুরে সাইনা বা তুর পর্বত, যার পাদদেশে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি, যেখানে শীত ও গরমের তীব্রতা সবথেকে বেশী, এখানেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর সাথে কথোপকথন করেছিলেন। লক্ষ্য করলাম, হারুনী নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি। তুর পর্বত ও আশে পাশের দৃশ্য দেখে ওর হাতের ক্যামেরা বার বার ঝলসে উঠছে। ফিল্ম বন্দী হচ্ছে তুর পর্বত ও চারদিকের দৃশ্য।

ইতিহাসের পেছনের ইতিহাস

মিসরের রাজধানী কায়রো থেকে সাড়ে চারশত কিলোমিটার দূরে মরুপ্রান্তর, সুয়েজ ট্যানেল ও দুর্গম গিরি পথ পাড়ি দিয়ে আমরা কেনো এখানে এলাম! শুধু আমরাই নই, সারা দুনিয়া থেকে প্রতিদিন মুসলিম-অমুসলিম অগণিত মানুষ এখানে আসছে। কিন্তু কেনো, কিসের আকর্ষণে তারা এখানে আসছে! এখানে এমন কি রয়েছে যার দুর্দমনীয় আকর্ষণ মানুষকে চম্বুকের মতোই এখানে টেনে নিয়ে আসছে! হ্যাঁ, আকর্ষণ রয়েছে। যে আকর্ষণের কাছে মানুষ নিজের কষ্টার্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করে এবং কষ্ট স্বীকার করে হলেও এখানে এসে নিজেকে ধন্য মনে করছে। কেনো আসছে, সে সম্পর্কেই এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

তুরে সাইনা বা তুর পর্বত ও এই এলাকার সাথে জড়িত রয়েছে মহান নবী-রাসূলদের ইতিহাস। এই পর্বত এবং এলাকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী-রাসূলদের স্মৃতিধন্য। এ

কারণেই সাধারণ মানুষ এখানে এসে নিজেকে ধন্য মনে করে। যে সময়ের ইতিহাস উল্লেখ করছি, সে সময়ে এখানে বিশেষ এলাকায় ইবরানী ভাষা প্রচলিত ছিলো। ইবরানী ভাষায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের পিতা হযরত হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্ সালামকে বলা হতো 'ইসরাঈল'। দুইটি শব্দের সমষ্টি হলো ইসরাইল। 'ইসরা এবং ঈল মিলিত হয়ে ইসরাঈল শব্দ গঠিত হয়েছে। ইসরা শব্দের অর্থ হলো 'চাকর বা গোলাম' এবং ঈল শব্দের অর্থ 'স্রষ্টা বা মনিব'। অর্থাৎ স্রষ্টার চাকর বা গোলাম। আরবী ভাষায় বলা হয় 'আব্দুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহর গোলাম। হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামের সন্তানদের থেকে যে বংশধর সৃষ্টি হয়েছিল, তাদেরকেই কোরআন-হাদীস ও ইতিহাসে বনী ইসরাঈল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিসরে বনী ইসরাঈলীদের ওপরই ফিরআউনরা কর্তৃত্ব করতো এবং তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালাতো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামও ছিলেন এই বনী ইসরাঈলীদেরই একজন। তিনি যখন পৃথিবীতে আসবেন, সে সময়ে মিসরের শাসক ছিলো প্রথম রামসীস অর্থাৎ যে ফিরআউন ডুবে মরেছে, সেই ফিরআউনের পিতা। এই ব্যক্তি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলো এবং তার দরবারের গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলো। দরবারী জ্যোতিষীরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেছিলো, বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে একজন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, যে সন্তান বড় হয়ে ফিরআউনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হবে।

আতঙ্কিত ফিরআউন তৎক্ষণাত আদেশ দিলো, মিসরে বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সাথে সাথে তাকে হত্যা করতে হবে। বনী ইসরাঈলীরা ছিলো শাসিত, অবদমিত, নির্যাতিত তথা পরাধীন, এ কারণে তাদের পক্ষে সংগঠিত প্রতিবাদ করাও সম্ভব ছিলো না। ফলে ফিরআউন কর্তৃক নিয়োজিত লোকজন অসংখ্য শিশু হত্যা করলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এই অবস্থার মধ্যেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে বনী ইসরাঈলীদের ঘরেই প্রেরণ করলেন। ভয়ে আতঙ্কে হযরত মূসার মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা দিশেহারা হয়ে পড়লো, শিশু পুত্রের জীবন রক্ষার চিন্তায় তারা যখন অস্থির, ঠিক তখনই শিশুর মায়ের অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালা বুদ্ধির উদয় করে দিলেন।

হযরত মূসার মা পানিতে ভেসে থাকার মতো একটি বিশেষ পাত্র যোগাড় করে তার মধ্যে শিশু মূসাকে শুইয়ে দিয়ে নীলনদে ভাসিয়ে দিলেন। পবিত্র কোরআনে সূরা

কাসাস-এ এই ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাগর থেকে ভাসমান এই শিশুকে উঠিয়ে নিলো স্বয়ং ফিরআউন– যে ফিরআউনই আতঙ্কিত হয়ে বনী ইসরাঈলীদের সকল শিশু সন্তানকে হত্যা করার নির্দেশ জারি করেছিলো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চরম শত্রুর ঘরেই তাঁর নবীকে উঠিয়ে দিয়ে রাজকীয় আরাম-আয়েশে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলেন। রাজকুমার হিসেবেই হযরত মূসা রাজা প্রথম রামসীস বা ফিরআউনের ঘরে প্রতিপালিত হলেন। সে যুগে রাজ পরিবারের সদস্যদের যুদ্ধের কলাকৌশল ও অন্যান্য শিক্ষা গ্রহণ করা ছিলো বাধ্যতামূলক। রাজকুমার হিসেবে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। এই শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। এ ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই করেছিলেন।

তখন সূর্য ছিলো মেঘের আড়ালে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে কাজ সমাপ্ত করতে চান, তা তিনি কিভাবে সমাপ্ত করবেন, তাঁর সে কৌশল মানুষের পক্ষে কাজ সমাপ্ত হবার পূর্বে বুঝার কোনো উপায়ই নেই। কাজ সমাপ্ত হবার পূর্বে মানুষ ক্ষেত্র বিশেষে বড় অস্থির হয়ে পড়ে যে, এই কাজ কিভাবে করা সম্ভব। কিন্তু যখন আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতী ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজ সমাপ্ত করেন, তখন সচেতন ও চিন্তাশীল মানুষ অনুধাবন করতে পারে যে, মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর কাজ সমাপ্ত করলেন।

বনী ইসরাঈলীদের মধ্যে কোনো পুত্র সন্তান জীবিত থাকলে সে একদিন ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন গড়ে তুলে পুনরায় মিসরের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারে, এ আশঙ্কায় তারা ইসরাঈলী পুত্র সন্তানদের হত্যা করার আদেশ জারী করেছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ এই শাসকদের অন্যায় অত্যাচার হতে সাধারণ মানুষকে হেফাজত করার জন্য ইসরাঈলীদের মধ্য হতেই একজনকে নির্বাচিত করলেন, যাকে নবুওয়াত দান করা হলো। এই সন্তানকে কিভাবে আল্লাহ হেফাজত করবেন এই চিন্তায় তাঁর মা ও পরিবারের লোকজন ছিল চিন্তিত।

এরপর আল্লাহ যখন এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত করলেন, তখন মানুষ বুঝলো যে, মহান আল্লাহ কিভাবে তাঁর কাজ সমাপ্ত করলেন। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের গোটা পরিবার এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই চিন্তিত ছিল, এই শিশু জীবিত থাকবে কি করে এবং কিভাবে লালন-পালন করা যাবে। যার ভয়ে তারা শঙ্কিত ছিল, মহান আল্লাহ এমন এক ব্যবস্থা করলেন যে, সেই প্রাণের শত্রুর ঘরেই তিনি লালিত পালিত

হলেন এবং পূর্ণ বয়স্ক যুবকে পরিণত হলেন। ইতোমধ্যে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিজের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে যেমন অবগত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিলো। তিনি যে রাজপরিবারে বাস করতেন, সে রাজপরিবার তৎকালে সাধারণ জনগণ থেকে অনেক দূরে বাস করতো।

হযরত মূসা একদিন এমন এক সময় মূল শহরে প্রবেশ করলেন, যখন শহরের রাস্তা-পথ ছিলো জন কোলাহল মুক্ত এবং শহর ছিল নীরব-নিঝুম। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, দুইজন লোক মারামারি করছে। এই দুইজন লোকের মধ্যে একজন ছিলো বনী ইসরাঈলী ও আরেকজন ছিলো ফিরআউনের পক্ষের লোক এবং এই লোকটিই ছিলো অন্যায়কারী। বনী ইসরাঈলী লোকটি হযরত মূসাকে দেখে সাহায্যের জন্য ডাক দিলেন। তিনি প্রকৃত বিষয় জানার জন্য লোক দুটোর কাছে গিয়ে দেখলেন যে, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষের লোকটিই প্রকৃত অন্যায়কারী এবং সে ক্রমাগত বাড়াবাড়ি করেই যাচ্ছে। লোকটির বাড়াবাড়ির জবাবে হযরত মূসা লোকটিকে ঘুষি মারলেন।

হতভাগা লোকটি এক ঘুষিতেই পটল তুললো। তিনি এই লোকটিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করেননি, সামান্য একটু শিক্ষা দেয়াই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু লোকটি যে নোটিস না দিয়েই এভাবে বিশ্বাসঘাতকের মতো উল্টে পড়ে বিপদ ডেকে আনবে তা কে জানতো! আকস্মিকভাবেই এই দুর্ঘটনা ঘটে গেলো। এই হত্যাকান্ড ছিলো দুর্ঘটনার ফসল। কিন্তু এই দুর্ঘটনাই হযরত মূসাকে মিসর ত্যাগে বাধ্য করলো।

আল্লাহর নবী লজ্জা, অনুতাপ ও বিবেকের দংশনে দংশিত হতে লাগলেন। তিনি তৎক্ষণাত মহান আল্লাহর কাছে নিজেকে অপরাধী হিসেবে পেশ করে ক্ষমা চাইলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। অনিচ্ছাকৃত এই হত্যাকান্ডের বিষয়টি ক্রমশ শাসকগোষ্ঠীর কানে পৌঁছলো এবং বনী ইসরাঈলীদের একজন মূসা– আর সেই মূসার হাতেই মরেছে শাসকগোষ্ঠীর লোক। অতএব মূসা রাষ্ট্রদ্রোহী, তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলো। শাসকগোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত হযরত মূসাও একজন শুভাকাঙ্খীর মাধ্যমে জানতে পারলেন।

সুতরাং তিনি এমন এক স্থানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যেখানে মিসর সরকারের আইন প্রযোজ্য নয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি মাদায়েন এলাকার দিকে যাত্রা

করলেন। এই দুর্ঘটনার কারণেই তাঁকে মিসর ত্যাগ করে মাদ্ইয়ান যেতে হলো এবং দীর্ঘ প্রায় দশ বছর পরে মাদ্ইয়ান থেকে মিসর ফেরার পথে এই তুর পর্বতেই তিনি মহান আল্লাহর কাছ থেকে নবুওয়াত লাভ করলেন। সুতরাং দুর্ঘটনাটি ছিলো যেনো মেঘের মতো, আর নবুওয়াত লাভ যেনো সূর্যের মতো। সেই দূর্ঘটনা নামক মেঘের আড়ালেই নবুওয়াত নামক প্রদীপ্ত সূর্য লুকিয়ে ছিলো। যা এই তুর পর্বতের চূড়ায় প্রকাশিত হয়েছিলো– যেখানে এখন আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি।

কতদূরে সেই মাদ্ইয়ান

হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালাম মাদ্ইয়ানে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মাদ্ইয়ান মূলতঃ বিশেষ কোনো স্থানের নাম নয়; বরং একটি গোত্রের নাম। এই গোত্রের নামানুসারেই তাদের এলাকার নাম মাদ্ইয়ান বলে পরিচিতি লাভ করেছিলো। এই গোত্রটি হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের পুত্র মাদ্ইয়ানের বংশধর। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামের তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার গর্ভে মাদ্ইয়ানের জন্ম হয় এবং এ কারণে হযরত ইবরাহীমের এই বংশধর বনিকাতুরা নামে অভিহিত হয়।

মাদ্ইয়ান তাঁর স্ত্রী-পুত্র পরিজনসহ নিজের বৈমাত্রেয় ভাই হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের পাশেই হেজাযে বসবাস করতো। এই বংশই পরবর্তীকালে একটি বিরাট গোত্র বা গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করেছিল। আর শুআইব আলায়হিস্ সালামও যেহেতু এই বংশের এবং এই গোত্রের একজন ছিলেন। সুতরাং তাঁর নবী হিসেবে প্রেরিত হওয়ার পর থেকে এই গোত্রটি 'কাওমে শুআইব' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

এই গোত্রটি কোন্ স্থানে বসবাস করতো– এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, এরা হেজায প্রদেশে শামের সাথে সংমিলিত এমন একস্থানে বসবাস করতো যার পরিধি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির পরিধি বরাবর অবস্থিত। আবার কেউ কেউ বলেন, শামের সাথে মিলিত 'মআন' নামক ভূখণ্ডে বসবাস করতো।

কিন্তু আল্লাহর কোরআন এই গোত্রের বাসভূমি সম্পর্কে দু'টো কথা জানিয়ে দিয়েছে, তারা 'ইমামে মুবিন'-এর ওপর বসবাস করতো। আরব দেশের ভূগোলে যে রাজপথটি হেজাযের ব্যবসায়ী কফেলাগুলোকে শাম, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন এবং মিসর পর্যন্ত নিয়ে যেতো এবং সে পথ লোহিত সাগরের পূর্ব দিকের বেলাভূমি দিয়ে গিয়েছিলো। পবিত্র কোরআন সেই পথটিকেই 'ইমামে মুবীন, অর্থাৎ, মুক্ত ও পরিষ্কার

রাজপথ হিসেবে বর্ণনা করেছে। কারণ গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল উভয় মৌসুমেই কুরাইশ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোর জন্য এই পথটি বাণিজ্য পথ ছিল। এই পথ স্থলভাগের সীমার সাথে জল ভাগের সীমা রেখাকেও সংযুক্ত করে দিয়েছিলো। তারা 'আছহাবে আইকাহ্' বা ঝোপ ঝাড়ের অধিবাসী বলেও অভিহিত হতো। আরবী ভাষায় 'আইকাহ্' সবুজ বরণ ঝোপ ঝাড়কে বলা হয় যা সবুজ ও সতেজ বৃক্ষ-লতার প্রাচুর্যের দরুন বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ঝোপের আকৃতি ধারণ করে।

পবিত্র কোরআন থেকে এই দু'টো বিষয় জেনে নেয়ার পর মাদ্ইয়ানের গোত্রের বসতির সন্ধান সহজেই জানা যেতে পারে। তাহলো মাদ্ইয়ানের গোত্রটি লোহিত সাগরের পুর্ব তীরে এবং আরব দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন জায়গায় বসবাস করতো যা শামদেশের সাথে সংযুক্ত হেজাযের শেষাংশ বলা যেতে পারে। আর হেজাযবাসীরা শাম, ফিলিস্তিন এবং মিসর পর্যন্ত যাতায়াতকালে 'আছহাবে মাদ্ইয়ান' এলাকার ধ্বংসাবশেষগুলো পথে পড়তো যা তাবুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ মাদ্ইয়ান গোত্রের বসতি উত্তর হেজায থেকে ফিলিস্তিনের দক্ষিণ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই বদ্বীপের শেষ কিনারা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় বিস্তৃত হয়েছিলো এবং এর কেন্দ্রস্থল ছিল মাদ্ইয়ান শহর।

আল্লামা মওদুদী (রাহঃ) বলেন, 'আমি ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাবুক থেকে আকাবায় যাওয়ার পথে ঐ জায়গা দেখেছি। স্থানীয় অধিবাসীরা আমাকে জানিয়েছে, বাপ-দাদাদের আমল থেকে আমরা শুনে আসছি মাদ্ইয়ান এখানেই অবস্থিত ছিল। ইউসিফুস থেকে নিয়ে বার্টন পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক পরিব্রাজক ও ভুগোলবিদগণও সাধারণভাবে এ স্থানটিকেই মাদ্ইয়ান বলে চিহ্নিত করেছেন। এই এলাকার সামান্য দূরে একটি জায়গাকে বর্তমানে 'মাগায়েরে শু'আইব' বা 'মাগারাতে শু'আইব' বলা হয়। সেখানে সামূদী নক্সার কিছু ইমারত রয়েছে। আর এর প্রায় এক/ দুই মাইল দুরে কিছু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এর মধ্যে আমরা দেখেছি দু'টি অন্ধকুপ। স্থানীয় লোকেরা আমাদের জানিয়েছে, নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারি না, তবে আমাদের এখানে একথাই প্রচলিত যে, এদু'টি কুয়ার মধ্য থেকে একটি কূয়ায় হযরত মূসা তাঁর ছাগলদের পানি পান করিয়েছেন।'

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মুফাস্সীরে কেরাম এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মত পোষণ করেন। 'আছহাবে মাদ্ইয়ান' এবং আছহাবে আইকাহ্' একই গোত্রের দু'টো নাম– না এরা দু'টো পৃথক পৃথক গোত্র, এ নিয়েই মতভেদ.।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, এ দু'টো পৃথক পৃথক গোত্র। মাদ্‌ইয়ান ছিল একটি সভ্য ও শহর এলাকার গোত্র। আর আছহাবে আইকাহ্ ছিল গ্রাম এবং যাযাবর গোত্র যারা বনে জঙ্গলে বাস করতো। এই কারণে তাদেরকে 'আছহাবে আইকাহ্' অর্থাৎ বন-জঙ্গলের অধিবাসী বলা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মুফাস্‌সীর বলেছেন, এ দু'টো একই গোত্র ছিলো। জলবায়ুর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এবং নদী নালার প্রাচুর্য এই স্থানটিকে এতই সরস ও মনোমুগ্ধকর করে দিয়েছিল যে, এখানে নানা ধরনের ফল ও আকর্ষণীয় ঘ্রাণযুক্ত ফুলের বাগান ছিলো। যদি কেউ সেই এলাকার বাইরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতো, তাহলে তার মনে হতো– এই এলাকা খুবই সুন্দর ও ঘন সবুজ বৃক্ষ পরিবেষ্টিত। এ কারণেই পবিত্র কোরআন এই এলাকাকে 'আছহাবে আইকাহ্' হিসেবে বর্ণনা করেছে।

তাফসীরে ইবনে কাসীর-এ উল্লেখ করা হয়েছে, এই এলাকায় 'আইকাহ্' নামে একটি গাছ ছিল। গোত্রের লোকেরা সেই গাছের পূজা করতো এবং এ কারণে মাদ্‌ইয়ান গোত্রকেই আছহাবে আইকাহ্ বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে, মাদ্‌ইয়ান এবং আছহাবে আইকাহ্ একই গোত্র। যাদেরকে পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে মাদ্‌ইয়ান বলা হয়েছে এবং বসত ভূমির স্বাভাবিক এবং ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে 'আছহাবে আইকাহ্' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে তাফহিমূল কোরআনের বর্ণনা হলো, আইকাবাসী হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালামের বংশের লোক। এ বংশটির নাম ছিল বনী মাদ্‌ইয়ান। তাদের এলাকার কেন্দ্রীয় শহরের নামও ছিল মাদ্‌ইয়ান এবং সমগ্র এলাকাকেই মাদ্‌ইয়ান বলা হতো। আর 'আইকাহ্' ছিল তাবুকের প্রাচীন নাম। আইকাহ্ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঘন জংগল। বর্তমানে একটি পাহাড়ী ঝর্ণার নাম আইকাহ্। এই ঝর্ণার জাবালে নূরে উৎপন্ন হয়ে আফাল উপত্যাকায় এসে পড়েছে।

দুর্গম-গিরিপথের সেই সাহসী যাত্রী

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর সম্পর্কে রাজদরবারে অশুভ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তখন তিনি মহান আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন, আমাকে এই জালিমদের কবল থেকে উদ্ধার করুন। ধারণা করা যায় যে, মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে ইশারা প্রদান করা হয়েছিল মাদ্‌ইয়ান এলাকায় হিজরত করার জন্য এবং তিনি রওয়ানা দিয়েছিলেন।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর বর্ণনা উল্লেখ করে ঐতিহাসিক আত্ তাবারী উল্লেখ করেছেন, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যে পথে

রওয়ানা দিলেন, সে পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। তাকে একাকী পথ চলতে হয়েছিল। আহারের জন্য তাঁর সাথে কোনো খাদ্য বস্তুও ছিল না। পান করার মত পানি নেই–নেই কোনো পথপ্রদর্শক। প্রচন্ড ক্ষুধায় তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়তেন, তখন তিনি প্রাণ বাঁচানোর জন্য গাছের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হতেন। পথ এমন দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ ছিল যে, তাঁর পবিত্র পায়ের চামড়া উঠে গিয়েছিল। চরম এক করুণ ও প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁকে মাদইয়ান এলাকায় পৌঁছতে হয়েছিল।

আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মাদ্ইয়ান এলাকায় হিজরত সম্পর্কে পবিত্র কোরআন জানাচ্ছে, '(মিসর থেকে বের হয়ে) যখন মূসা মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা হলো তখন সে বললো, 'আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।' (সূরা কাসাস-২২)

আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন–মুফাস্সিরীনে কেরাম মিসর ত্যাগ করার সময় হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের এই কথার অর্থ করেছেন যে, এমন পথ যার সাহায্যে সহজে মাদ্য়ানে পৌঁছে যাবো।

ইতোপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, সে সময় মাদ্য়ান ছিল ফিরআউনের রাজ্য-সীমার বাইরে। সমগ্র সিনাই উপদ্বীপে মিসরের কর্তৃত্ব ছিল না। বরং তার কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ ছিল পশ্চিম ও দক্ষিণ এলাকা পর্যন্ত। আকাবা উপসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম তীরে ছিল বনী মাদ্ইয়ানের বসতি এবং এই এলাকা ছিল মিসরীয় প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এ কারণে হযরত মূসা মিসর থেকে বের হয়েই মাদ্ইয়ানের পথ ধরেছিলেন। কারণ এটাই ছিল মিসর শাসকের কর্তৃত্বমুক্ত জনবসতিপূর্ণ স্বাধীন এলাকা ছিলো মাদ্ইয়ান। কিন্তু সেখানে যেতে হলে তাঁকে অবশ্যই মিসর অধিকৃত এলাকা দিয়েই এবং মিসরীয় নিরাপত্তারক্ষীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে হবে। এ জন্যই তিনি তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আমাকে এমন পথে নিয়ে যাও যে পথ দিয়ে আমি নিরাপত্তার সাথে মাদ্ইয়ানে যেতে পারি।

আশ্রয়ের সন্ধানে আল্লাহর নবী

মহান আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের জীবন অত্যন্ত ঘটনা বহুল। তাঁর পবিত্র জীবনে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তা পৃথক করে লিখতে গেলে বিশাল আকৃতির গ্রন্থ রচিত হবে। আমি আমার এই সফর নামায় একান্ত প্রয়োজনে সংক্ষিপ্তকারে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি মাত্র। হযরত মূসা মিসরে অবস্থানকালে রাজপরিবার ও রাজপরিবারের সমর্থক কর্তৃক সাধারণ মানুষের ওপরে নানা ধরনের

অবিচার- অত্যাচার দেখে ব্যথিত হতেন। সেই একই অবস্থা দেখলেন মাদ্ইয়ানে এসেও। মিসরে যেমন শক্তিমানরা দুর্বলদের অধিকার বুঝে দেয়না, ঠিক এখানেও দুর্বলদের অধিকার বুঝে দেয়া হচ্ছে না। এই অন্যায় অবিচার থেকে এই এলাকাও মুক্ত নয়।

তিনি যেখানে অবস্থান করছিলেন, সেখানে পানি পান করার দুটো কুয়ো ছিলো। দিন শেষে পশুপালকের দল এই কুয়ো থেকে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতো। হযরত মূসা দেখছেন, লোকজন কে কার আগে পশুদলকে পানি পান করাবে এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আর এই অবস্থায় দুটো মেয়ে দুরুত্ব বজায় রেখে অসহায়ের মতো পানির কুপের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের চেহারায় ফুটে উঠেছে করুণ আকুতি।

শক্তিমান লোকগুলোর সাথে অসহায় দুটো যুবতীর পক্ষে ধক্কাধাক্কি করে তাদের পশুদলকে পানি পান করানো সম্ভব হচ্ছে না। তারা বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করছে, কখন এই লোকগুলো পানির কূপ ছেড়ে চলে যাবে তারপর তারা পানি পান করাবে। শুধু মেয়ে দুটোই নয়– বর্তমান যুগের মতো সে যুগেও যাদের পেশীশক্তি ছিলো, তারাই সবকিছুর ওপরে প্রথমে নিজেরা কামড় বসাতো। অবশিষ্ট যা থাকতো, তাই শক্তিহীন দুর্বল লোকগুলো ভাগে পেতো। শক্তি না থাকার কারণে তারা শক্তিমানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করারও সাহস পেতো না।

এই ঘটনা পবিত্র কোরআনে সূরা কাসাস-এ উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মূসা মেয়ে দুটোকে প্রশ্ন করার পর মেয়ে দুটো তাদের সমস্যার কথা জানিয়ে এ কথাও জানালো যে, তাদের পরিবারে কোনো পুরুষ মানুষ নেই, পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ, তিনি এসব ঝক্কি সহ্য করতে পারেননা বিধায় তারা বাড়ির বাইরের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। মেয়ে দুটো যখন তাদের অসহায়ত্ব অকপটে জানিয়ে দিল তখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হলেন। তিনি দেখলেন এই পানি পান করানোর ব্যাপারে যে অবিচার চলছে আর অবিচারের নির্মম শিকার হলো এই শক্তিহীনা মেয়ে দুটো। তিনি জনতার ভীড় ঠেলে পানির কূয়ার কাছে গেলেন। তারপর কূপ থেকে পানি উঠিয়ে মেয়ে দুটোকে সাহায্য করলেন। পেশীশক্তির মাধ্যমে যারা প্রথমে পানি উঠাচ্ছিলো, তারা হযরত মূসাকে বাধা দিতে সাহস পায়নি।

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত মূসা সেই শিশু কাল থেকে যৌবনে পৌঁছা পর্যন্ত রাজপরিবারের সদস্য হিসেবেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন। এ কারণে

রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে তাঁকেও নানা ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়েছিলো। তাঁর দেহ থেকে যেনো শক্তি-সামর্থ স্ফুরিত হচ্ছিলো। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'মিরাজের রাতে মূসাকে আমি দেখেছি, তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী এবং দীর্ঘদেহী ছিলেন।' (বোখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

এ কারণেই পানির কূপের কাছে যারা পেশীশক্তির দাপট দেখাচ্ছিলো, তারা হযরত মূসাকে বাধা দেয়নি। তারা বুঝে ছিলো, এ লোক 'যেমন কুকুর তেমন মুগুর' দেয়ার লোক। বেশী বাড়াবাড়ি করলে চেহারা পরিবর্তন করে দেবে। শুধু তাই নয়, এখানের দুর্বল লোকগুলো যদি এই লোকটির সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহালে মারাত্মক বিপদ দেখা দেবে।

এসব দিক চিন্তা করেই ঐসব লোকগুলো হযরত মূসাকে বাধা দেয়নি। ক্ষুধায় তিনি ছিলেন কাতর, কন্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ পাড়ি দেয়ার কারণেও তিনি ছিলেন খুবই ক্লান্ত। এরপর মাথায় ছিলো আশ্রয় লাভের চিন্তা। বিশ্রামের জন্য তিনি গাছের ছায়ায় বসে মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে ফরিয়াদ জানালেন, 'হে আমার মালিক! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযিল করো, আমি তারই মুখাপেক্ষী।' এরপরই সেই মেয়ে দুটোর একজন তাঁর কাছে ফিরে এসে তাঁকে জানালো যে, তাদের আব্বা পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য তাঁকে ডাকছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা কাসাস-এ এই মেয়েটির স্বভাব ও চাল-চলনের খুবই প্রশংসা করা হয়েছে।

হযরত মূসা মেয়েটির সাথে তাদের বাড়িতে গেলেন, তিনি শুধু মেয়ে দুটোর পশুদলকে পানি পান করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, এই সামান্য কাজের বিনিময় তাঁকে দেয়া হবে- এই আশায় তিনি মেয়েটির পিতার ডাকে তাঁর বাড়িতে যাননি। আল্লাহর একজন নবী এ ধরনের ঠুনকো ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন, এ কথা কল্পনাও করা যায় না। বাস্তবতা অনুধাবন করতে হলে সে সময়ে হযরত মূসার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হবে। তাঁর মতো একজন মহানুভব ব্যক্তি আহ্বানকারীর বাড়িতে গেলেন, এ থেকে একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি সে সময় চরম দুরাবস্থায় পতিত ছিলেন।

একেবারে শূন্য হাতে কপর্দকহীন অবস্থায় অকস্মাৎ তিনি মিসর থেকে বের হয়েছিলেন। এখানে আসার ব্যাপারে তাঁর কোনো ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি ছিলো না। আর মিসর থেকে মাদইয়ান পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পৌছতে সে সময় প্রায় আটদিন

লাগার কথা। ক্ষুধা, পিপাসা এবং সফরের ক্লান্তিতে তাঁর অবস্থা চরম নাজুক হয়ে পড়েছিলো। এরপর তিনি যেখানে এলেন, এটা বিদেশে। এই পরবাসে অপরিচিত স্থানে থাকার জায়গা পাওয়া যায় কিনা এবং এমন কোনো সমব্যথী পাওয়া যায় কিনা যার কাছে আশ্রয় নেয়া যেতে পারে, সম্ভবত এ চিন্তা তাঁর মাথায় ছিলো। উপস্থিত অক্ষমতার কারণেই সামান্য কাজের পারিশ্রমিক দেবার জন্য ডাকা হচ্ছে শুনে তিনি সে মেয়েটির বাড়িতে যাবার ব্যাপারে ইতস্তত করেননি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, 'আল্লাহর কাছে এখনই আমি যে দোয়া করেছি তা কবুল করার এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে, তাই এখন অনর্থক আত্মমর্যাদার ভান করে আল্লাহর দেয়া আতিথ্যের আহবান প্রত্যাখ্যান করা সংগত নয়।'

মেয়েটির পিতা আগত এই যুবককে দেখে চিনতে ভুল করেননি। তিনি যুবককে আশ্রয় দিয়ে আশ্বস্ত করে জানালেন যে, 'এখন আর তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই, তুমি আমার কাছেই থাকবে।' হযরত মূসা ঐ লোকটির পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেলেন এবং আট বছর এই পরিবারেই থাকতে হবে, এই শর্তের বিনিময়ে তিনি ঐ আল্লাহভীরু লোকটির মেয়েকে বিয়ে করলেন। আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যে পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং পরিবার প্রধানের মেয়েকে বিয়ে করলেন, সেই লোকটির পরিচয় সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে।

অনেকে ধারণা করে থাকেন যে, তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর আরেকজন নবী হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম। কারণ কোনো কোনো হাদীসে সে লোকটির নাম হযরত শু'আইব বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর এবং ইবনে কাসীর তাঁরা উভয়ে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, এসব হাদীসের সনদ বা বর্ণনা সূত্র নির্ভুল নয়। এসব হাদীস দুর্বল। একথা স্পষ্ট যে, লোকটি ছিলো মুসলমান এবং আল্লাহভীরু। লোকটি যদি হযরত শু'আইব আলাইহিস্ সালাম হতেন, তাহলে তাঁর পরিচয় কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতো। কারণ হযরত শু'আইব সম্পর্কে কোরআনে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ঠিক এ কারণেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু উবাইদাহ্, সাঈদ ইবনে যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈন ঐ লোকটির নাম হযরত শু'আইব বলে উল্লেখ করেননি। তাঁরা যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত শু'আইবের নাম স্পষ্ট করে শুনে থাকতেন, তাহলে তা অবশ্যই উল্লেখ করতেন।

তুরে সাইনার পথে আল্লাহর নবী

দীর্ঘ প্রায় দশটি বছর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম নিজ মাতৃভূমি ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে মিসর শাসকের নিয়ন্ত্রণের বাইরের এলাকা মাদ্ইয়ানে থাকলেন। এখানে তিনি একা সম্পূর্ণ কপর্দকহীন অবস্থায় এসেছিলেন, মহান আল্লাহ তাঁকে আশ্রয় জুটিয়ে দিলেন– দিলেন জীবন সঙ্গিনী ও সন্তান-সন্ততি। দশ বছর পরে তিনি মিসরে ফেরৎ যাবার পরিকল্পনা করলেন। সম্ভবত তিনি মনে করে থাকবেন, দশটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, যে ফিরআউনের শাসনামলে তিনি মিসর থেকে বের হয়েছিলেন সে মারা গেছে, এখন যদি তিনি নীরবে সেখানে চলে যান এবং নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে অবস্থান করেন তাহলে হয়তো তাঁর কথা কেউ জানতেই পারবে না। পরিকল্পনা অনুসারে তিনি সময়-সুযোগ করে স্ত্রী ও অন্যদের সাথে নিয়ে তিনি মিসরের দিকে রওয়ানা করেছিলেন।

মাদ্ইয়ান এলাকা ছিলো আকাবা উপসাগরের তীরে আরব ও সিনাই উপদ্বীপের উপকূলে। সেখান থেকে মিসরের দিকে যে পথ গিয়েছে, সেই পথেই তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই পথেই তুর পর্বত অবস্থিত। পবিত্র কোরআনের গবেষগণ বলেন, হযরত মূসা সাইনা উপদ্বীপের দক্ষিণ এলাকা অতিক্রম করছিলেন, পথ চলতে চলতে তুর পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছতে রাত হয়ে গিয়েছিলো এবং তখন মৌসুম ছিলো শীতের। সে যুগে বর্তমান যুগের মতো টর্চ লাইট বা যেখানে-সেখানে আলো জ্বালানোর কোনো উপকরণ ছিলো না। তারা আলো জ্বালাতো এক ধরনের পাথর ব্যবহার করে। প্রচন্ড ঠান্ডা, চারদিকে ঘন অন্ধকার, এ অবস্থায় আলো ও তাপ একান্ত প্রয়োজন। তিনি আলোর সন্ধানে এদিক-ওদিক দৃষ্টি দিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন সম্মুখে কোথাও আলোক রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম শীতকালে কুয়াশা আবৃত রাতের ঘন অন্ধকারে একটি অপরিচিত এলাকা অতিক্রম করছিলেন। এই এলাকার পথ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিলো না। আলো দেখে তিনি মনে করেছিলেন সেখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে যার সাহায্যে শিশু সন্তান ও পরিবারের লোকজনদের সারারাত গরম রাখার ব্যবস্থা হবে অথবা কমপক্ষে সামনের দিকে অগ্রসর হবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি দুনিয়ার পথের সন্ধান পাওয়ার কথা চিন্তা করেছিলেন আর পেয়ে গেলেন সেখানে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের পথ। তিনি নিজের স্ত্রী ও অন্যদের বললেন, 'আমি সামনের দিকে এগিয়ে একটু জেনে আসি আগুন জ্বলছে

কোন্ জনপদে, সামনের দিকের পথ কোথায় কোথায় গিয়েছে এবং কাছাকাছি কোন্ কোন্ জনপদ আছে। তবুও যদি দেখি যে ওরাও আমাদেরই মতো চলমান মূসাফির, যাদের কাছ থেকে এই এলাকা সম্পর্কে কিছুই জানা যাবে না, তাহলে তাদের কাছ থেকে আগুনের ব্যবস্থা তো করা যাবে। আগুনের ব্যবস্থা হলে তোমরা উত্তাপ লাভ করতে পারবে।'

হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম যেখানে কুঞ্জবনের মধ্যে আগুন লেগেছে বলে দেখেছিলেন সে স্থানটি তূর পাহাড়ের পাদদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম খৃষ্টান বাদশাহ কনস্টানটাইন ৩৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঠিক যে জায়গায় এ ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে একটি গীর্জা নির্মাণ করেছিলেন। এর ২০০ শত বছর পরে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এখানে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। পূর্বে নির্মিত কনষ্টান্টাইনের গীর্জাকেও এই আশ্রমের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। সে আশ্রম ও গীর্জা বর্তমানেও আছে এবং এটি গ্রীক অর্থোডক্স চার্চের অধীনে রয়েছে।

পবিত্র উপত্যকা– জুতা খুলে এসো

নিজের স্ত্রী ও সন্তান এবং সাথের অন্যদের পথিমধ্যে রেখে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সম্মুখে আলো দেখে আগুনের সন্ধানে চললেন। বেশ কিছুটা যাবার পরে তিনি যখন সেই বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার মুখোমুখি হলেন, তখন সেই আলো থেকেই যেনো আওয়াজ এলো– 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ- তোমার রব। তুমি এখন পবিত্র উপত্যকায় রয়েছো, সুতরাং জুতা খুলে এখানে এসো।' এই ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েটি সূরায় বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। আমরা আমাদের সফরনামায় এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'সেখানে পৌছলে তাঁকে ডেকে বলা হলো, 'হে মূসা! আমিই তোমার রব, জুতো খুলে ফেলো, তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় আছো। আমিই আল্লাহ্, তোমাকে বাছাই করে নিয়েছি, শোনো যা কিছু অহী করা হয়। আমিই আল্লাহ্, আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, সুতরাং তুমি আমারই দাসত্ব করো এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম করো।' (সূরা ত্ব-হা-১১-১৪)

'সেখানে পৌছার পর উপত্যকার ডান কিনারায় পবিত্র ভূখন্ডে একটি বৃক্ষ থেকে আহবান এলো, 'হে মূসা! আমিই আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের অধিপতি।' (সূরা আল কাসাস-৩০)

'সেখানে পৌছানোর পর আওয়াজ এলো, 'ধন্য সেই সত্তা যে এ আগুনের মধ্যে এবং এর চারপাশে রয়েছে, পাক-পবিত্র আল্লাহ সকল বিশ্ববাসীর প্রতিপালক। হে মূসা! আমিই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ।' (সূরা নাম্‌ল-৭-৮)

পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে, 'উপত্যকার ডান কিনারায় পবিত্র ভূখন্ডে অবস্থিত একটি বৃক্ষ থেকে কথাগুলো ভেসে এলো।' মুফাস্‌সিরীণে কেরাম বলেছেন, ডান কিনারা বলতে হযরত মূসার হাতের ডান দিকে উপত্যকার যে কিনারা ছিলো, তাই বুঝানো হয়েছে। আর 'পবিত্র ভূখন্ড' বলতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক সৃষ্ট দ্যুতির আলোকে যে ভূখন্ড আলোকিত হয়েছিলো, তাই বুঝানো হয়েছে। সূরা ত্বা-হায় উক্ত স্থান সম্পর্কে 'আল মুকাদ্দাসে তুওয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মুফাস্‌সীরদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, 'তুওয়া' সেই উপত্যকাটির নাম, যেখানে হযরত মূসা আলো দেখতে পেয়েছিলেন এবং মহান আল্লাহর কথা শুনে ছিলেন। আবার কোনো কোনো মুফাস্‌সীর বলেছেন, 'আল মুকাদ্দাসে তুওয়া বা পবিত্র তুওয়া উপত্যকা' অর্থ হলো, এমন উপত্যকা যাকে বিশেষ এক সময়ের জন্য পবিত্র করা হয়েছে।

সূরা কাসাসে বলা হয়েছে, আওয়াজ আসছিল একটি বৃক্ষ থেকে, যে বৃক্ষটি ছিলো সম্পূর্ণ আলোকিত। মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বলেছেন, কোরআনের বর্ণনা পাঠ করে যে দৃশ্য সম্মুখে ভেসে ওঠে তাহলো, উপত্যকার ডান কিনারে অবস্থিত একটি গাছ থেকেই আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। এটি এমন আলো ছিলো যে, তা আগুন নয় এবং কোনো ধোঁয়াও ছিলো না। সেই আলোর মধ্যেই ছিলো একটি সবুজ-শ্যামল গাছ– যেখান থেকে সহসা আওয়াজ আসছিলো।

সকল নবী-রাসূলদের সাথেই এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকা ছিলো নবুওয়াতী ধারার চিরাচরিত বিষয় এবং এটি নতুন কোনো বিষয় ছিলো না। তবে ঘটনার রূপ বা ধরন ছিলো ভিন্ন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রথম বার নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। তখন হেরা গিরি-গৃহায় একান্ত নির্জনে সহসা একজন ফেরেশতা আসেন। তিনি তাঁর কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে থাকেন। হযরত মূসার ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটে। তিনি মিসর যাবার পথে শীতের রাতে অজানা-অচেনা এক স্থানে অবস্থান করছেন। দূর থেকে আগুন দেখে পথের সন্ধান নিতে বা আগুন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সেখানে গেলেন। আকস্মাৎ সকল প্রকার আন্দাজ অনুমানের উর্ধ্বে অবস্থানকারী স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে তাঁর নাম ধরে আহ্বান জানালেন।

এখানে প্রশ্ন ওঠে, শীতের মৌসুমে কুয়াশাচ্ছন্ন রাতের ঘন অন্ধকারে এক গাছে উত্তাপ ও ধোঁয়া ছাড়াই আলো দেখা গেলো। সাধারণ মানুষ একাকী তা দেখলে এবং সেই আলোর মধ্য থেকে তার নাম ধরে অদৃশ্য কেউ ডাকছে, এটা শুনলে ভয়ে-আতঙ্কে দাঁত কপাটি লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়বে অথবা মা-বাপ চৌদ্দগুষ্ঠির নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠে এমন দৌড় দিবে, দশ মাইল দূরে গিয়ে তারপর পেছনে তাকিয়ে দেখবে যে, সে দৌড়াচ্ছে কেনো! হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ক্ষেত্রে এমন কেনো হলো না, কারণ তিনিও তো মানুষই ছিলেন?

ঘটনাটি আকস্মিক হলেও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সেই আলো দেখে বা আলোর মধ্য থেকে তাঁর নাম ধরে অদৃশ্য কেউ আহ্বান করছে– তা শুনে ভয় পাননি। কারণ নবী-রাসূলগণ তাঁদের বুদ্ধির বিকাশের পর থেকেই পৃথিবীর রব এবং ইলাহ সম্পর্কে যে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্থ হন, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। সেই শিশুকাল থেকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব– নবুওয়াতের দায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পণ করার জন্যই তাঁকে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো। এ কারণেই তাঁর জীবন ছিলো সংগ্রাম মূখর এবং ঘাত-প্রতিঘাত পূর্ণ। এ ধরনের অপার্থিব বা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার মন-মানসিকতা ও হিম্মত তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিলো।

এরপর প্রশ্ন ওঠে, যে আলো দেখা যাচ্ছে বা যে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, তা জ্বীন না অন্য কিছুর, এ ব্যাপারে হযরত মূসার অনুভূতি কি ছিলো?

অলৌকিক ঘটনা বা সাধারণ ঘটনা, কোন্ ঘটনা কি এবং কার দ্বারা তা সংঘটিত হচ্ছে, এ ব্যাপারেও নবী-রাসূলদেরকে সেই শিশুকাল থেকেই অনুভূতি দেয়া হয়ে থাকে। নবুওয়াত লাভ করার পূর্বেই তাঁদের বাহ্যিক চরিত্রে এবং মনের গভীরে এমন এক অপার্থিব অবস্থা বিরাজমান থাকে যে, যার ভিত্তিতে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান ঘটনা সম্পর্কে তাঁরা এটা স্পষ্ট অনুভব করতে পারেন, তিনি যা দেখছেন, এটা তাঁর দৃষ্টির বিভ্রম নয়। অথবা তাঁর মানসিক ভাবান্তরও নয় এবং তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতিও প্রতারিত হচ্ছে না বা এটা কেনো শয়তানের ভেল্কিও নয়।

এ কারণেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম নির্জন রাতে একাকী অবস্থায় আলো দেখে বা আলোর মধ্য থেকে তাঁকে আহ্বান করা হচ্ছে শুনে ভয় দূরে থাক– সামান্যতম বিচলিতও হননি। বরং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর আহ্বান শুনে ভয় না পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করেছিলেন, কেননা এই আল্লাহর সন্ধানেই তিনি এত দিন ছিলেন। তিনি যাঁকে পেতে চান, সেই প্রেমিক

আজ স্বেচ্ছায় তাঁকে আহ্বান করছেন–এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে! আবার প্রশ্ন ওঠে, তিনি যে আহ্বান শুনলেন, সে আহ্বান আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফেরেশতা করেছিলেন না স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে আহ্বান করেছিল?

পবিত্র কোরআনের সূরা ত্বাহা, সূরা কাসাস ও সূরা আন্ নাম্‌ল- এই তিনটি সূরার আয়াতেই বলা হচ্ছে, 'আমিই আল্লাহ'। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই তাঁর কুদরতী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে আহ্বান করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ আহ্বান করেছিলেন না আল্লাহর নির্দেশে তাঁর ফেরেশ্‌তা আহ্বান করেছিলো, এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা হবে নতুন আরেকটি ফেত্‌না সৃষ্টির শামিল।

এ তো শুধুই লাঠিই নয়!

বিচ্ছুরিত আলোর মধ্য থেকে নিজের নাম শুনে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম নিজেকে পরম সৌভাগ্যমান মনে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন। তাঁর পায়ে ছিলো জুতা, নির্দেশ এলো জুতা খুলে আসার। তিনি বিনয় অবনত চিত্তে জুতা খুলে সেখানে গেলেন এবং তাঁকে নবুওয়াতের পবিত্র বারি ধারায় সিক্ত করা হলো। মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে অনেক কথাই বলেছিলেন, যা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা শুধু এখানে সেই লাঠির বিষয়টি উল্লেখ করবো, যা শুধু লাঠিই ছিলো না– ছিলো আরো অন্য কিছু।

প্রশ্ন ওঠে, হযরত মূসার হাতে লাঠি ছিলো কেনো? এ প্রশ্নের জবাব হলো, সেই আবহমানকাল থেকেই বর্তমানকাল পর্যন্ত ডান হাতে লাঠি বা ছড়ি রাখা ক্ষমতা ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এখনও পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে সেনাপ্রধান ও পুলিশ প্রধানগণ হাতে বিশেষ ধরনের ছড়ি ব্যবহার করেন। নবী-রাসূলদের যুগেও তাঁরা ডান হাতে বিশেষ লাঠি রাখতেন। এ ছাড়া সে যুগে বর্তমান যুগের ন্যায় কোনো ধরনের যান্ত্রিক যান-বাহন ছিলো না। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় পায়ে হেঁটে বা পশুর পিঠে পথ অতিক্রম করতে হতো। পথ ছিলো বিপদ সঙ্কুল, বিষধর সাপসহ অন্যান্য হিংস্র প্রাণী এখানে-ওখানে ঘাপটি মেরে থাকতো। এসব কারণে তাঁরা হাতে লাঠি রাখতেন এবং প্রয়োজনে সে লাঠি ব্যবহারও করতেন। বেশ কিছু কথা বলার পর মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মূসাকে প্রশ্ন করলেন, 'আর হে মূসা! এ তোমার হাতে এটা কি?' (সূরা ত্বা-হা-১৭)

'মূসা জবাব দিল, 'এ আমার লাঠি। এর ওপর ভর দিয়ে আমি চলি, নিজের ছাগলগুলোর জন্য এর সাহায্য পাতা পাড়ি এবং এর সাহায্যে আরো অনেক কাজ করি।' (সূরা ত্বা-হা-১৮)

(আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন, 'একে ছুঁড়ে দাও হে মূসা!' (সূরা ত্বা-হা-১৯)

'সে ছুঁড়ে দিল এবং অকস্মাৎ সেটা হয়ে গেলো একটা সাপ, যা দৌড়াচ্ছিল। বললেন, 'ধরে ফেলো ওটা এবং ভয় করো না, আমি ওকে আবার ঠিক তেমনটিই করে দেবো যেমনটি সে আগে ছিল। আর তোমার হাতটি একটু বগলের মধ্যে রাখো, তা কোনো প্রকার ক্লেশ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। এ জন্য যে, আমি তোমাকে নিজের বৃহৎ নিদর্শনগুলো দেখাবো। এখন তুমি যাও ফিরআউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।' (সূরা ত্ব-হা-২০-২৪)

দীর্ঘ দিনের পরিচিত লাঠি, যা দিয়ে তিনি নিজের পশুপালকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং বৃক্ষের পাতা পেড়ে আহার করান। এই লাঠি তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন আর সাথে সাথে তা একটি বিশাল সাপের আকার ধারণ করে মতই মোচড় দিতে থাকলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। পবিত্র কোরআন বলছে, তিনি পেছনের দিকে এমন শক্তিতে দৌড় দিয়েছিলেন যে, পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখার মত তাঁর সাহস ছিল না যে, তাঁর সেই লাঠিটি সাপের মতই আচরণ করছে না স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

এই মুজিযা প্রদানের ঘটনা মহান আল্লাহ তা'য়ালা এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'আর (হুকুম দেয়া হলো) ছুঁড়ে দাও তোমার লাঠিটি। যখনই মূসা দেখলো লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই সে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং একবার ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, 'হে মূসা! ফিরে এসো এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার হাত বগলে রাখো উজ্জল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই। এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো। এ দু'টি উজ্জল নিদর্শন তোমার রবের পক্ষ থেকে ফিরআউন ও তার সভাসদদের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান।' (সূরা কাসাস-৩১-৩২)

মহান আল্লাহ জানতেন হযরত মূসার হাতে লাঠি আছে। তারপরেও তিনি এ জন্যই হযরত মূসাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁর হাতে যে লাঠি ব্যতীত অন্য কিছু নেই বা এটা যে শুধু লাঠিই সে বিষয়ে হযরত মূসা যেনো নিশ্চিত হয়ে যান এবং দেখতে

থাকেন, পরবর্তীতে সে লাঠি আল্লাহর নির্দেশে কোন্ শক্তির অধিকারী হয়। আর হযরত মূসাও শুধুমাত্র এটুকু জবাবই দিতে পারতেন যে, 'হে আল্লাহ! আমার হাতে এটি একটি লাঠি।'

কিন্তু হযরত মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তা তাঁর সে সময়কার মানসিক অবস্থার একটি চমৎকার ছবি তুলে ধরেছে। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন কোন বড় ব্যক্তির সাথে বা তাঁর কাংখিত ব্যক্তির সাথে কথা বলার সুযোগ পায় তখন নিজের কথা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে, যাতে তার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। হযরত মূসা বুদ্ধি বিকশিত হবার পর থেকেই যাঁকে খুঁজে ফিরছেন, সেই তিনি যখন স্বয়ং তাঁকে ডেকে কথা বলছেন, সেই কথা খুব অল্পতেই শেষ হয়ে যাক, এটা তিনি চাননি।

পবিত্র সেই উপত্যকায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে দুই মু'জিযা দিলেন। মুফাস্সিরীণে কেরাম বলেন, এই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দুইটি মু'জিযা দেয়ার কারণ হলো, হযরত মূসার মনে যেনো এই বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করে যে, যে সত্ত্বা তাঁকে আহ্বান করে কথা বলছেন, সেই সত্ত্বা হলেন সমগ্র বিশ্বলোকের যাবতীয় কিছুর স্রষ্টা, শাসক, পরিচালক ও মালিক এবং তিনিই তাঁর সাথে কথা বলছেন। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, তাঁকে একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার–Established Government ফিরআউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে খালি হাতে সেই সরকার প্রধানের মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচন্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন। আর সে অস্ত্র কোন মানুষের দান করা বা বানানো নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা এই অস্ত্র।

শুধু তোমাকেই চাই প্রভু!

পবিত্র উপত্যকার দিকে দৃষ্টি দিতেই মনের গহীনে এক অপার্থিব অনুভূতির উদয় হলো। সে অনুভূতি ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। মনের অবস্থা এমন ছিলো না যে, আমার সফর সঙ্গী অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন ও এটিএন বাংলার ইসলামী অনুষ্ঠানের পরিচালক স্নেহাষ্পদ আরকান উল্লাহ হারুনীর চেহারায় মনের কি অবস্থা ফুটে উঠেছে– তা দেখার।

এ তো সেই স্থানে আমি এসে উপস্থিত হয়েছি, যেখানে আমার সবথেকে প্রিয় সত্ত্বা-প্রিয় নাম 'আল্লাহ' সেই দূর অতীতে তাঁর নূরের তাজাল্লী নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই পবিত্র স্থানে আমি এই প্রৌঢ় বয়সেও সুদূর বাংলাদেশ থেকে ছুটে এসেছি, যেখানে বিশ্বলোকের প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কথা বলেছিলেন, তাঁরই প্রিয় নবী হযরত মূসার সাথে। 'আল্লাহ' এই নাম যে কি মিষ্টি মধুর– তা কেবলমাত্র তাঁরাই অনুভব করতে পারে, যাদের দিনরাতের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে তাঁকে পাবার আশায়। কেবলমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যারা সকল কর্মে থাকে তৎপর।

আমার পক্ষে আর নিজেকে সংবরণ করা সম্ভব হলো না। দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। মানুষকে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন কঠোরে-কোমলে মিশ্রিত করে। আমার সকল আবেগ মোমের মতোই গলে অশ্রুধারা হয়ে চোখ বেয়ে নেমে আসছে। সম্মুখে সেই পবিত্র উপত্যকা, কিন্তু সবকিছুই অস্পষ্ট দেখছি। অপ্রতিরোধ্য অশ্রুধারা দৃষ্টি শক্তি বারবার ঝাপ্‌সা করে দিচ্ছে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন এখানে এসেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে জুতা খুলে এখানে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরাও আদব রক্ষার্থে জুতা খুলে পবিত্র উপত্যকায় প্রবেশ করলাম। গোটা বিশ্বের মহাশক্তিধর সত্ত্বা, প্রতিপালক, যার সাথে তুলনা করার মতো কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই। সেই মহান সত্ত্বা এখানে তাঁরই নূরের তাজাল্লি নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তাঁর নবীর সাথে কথা বলেছিলেন, এ কথা কল্পনা করতেই আমার সমগ্র দেহ-মন সেই শক্তিধর সত্ত্বার ভয়ে কেঁপে উঠলো। এটা আমার আকীদা-আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাকে অবশ্যই দেখছেন যে, আমি একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির আশায় এখানে এসেছি।

নিজেকে কিছুটা সংবরণ করলাম, অধ্যাপক গিয়াস উদ্দীন সেই মহান সত্ত্বার একত্ব ঘোষণা করে আযান দিলেন, যে সত্ত্বা হযরত মূসাকে এই স্থানে ডেকে নামায আদায়

করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমরা যোহর-আসর একত্রে জামায়াতে আদায় করলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম সেই মূল স্থানে, যেখানে হযরত মূসা নবুওয়াত লাভ করেছিলেন। মহান আল্লাহর মুমিন বান্দাদের পক্ষে এখানে এসে নিজেকে স্বাভাবিক রাখা সম্ভব নয়। আমরা সকলেই এখানে মহান মালিকের দরবারে ধর্ণা দিলাম। মনের সকল চাওয়া অশ্রুসিক্ত ভাষায় সেই মালিকের কাছে নিবেদন করলাম, যে মালিক এই এখানেই তাঁর প্রিয় নবী হযরত মূসাকে বলেছিলেন, 'আমিই আল্লাহ! সমগ্র বিশ্বলোকের প্রতিপালক।' তাঁর কাছে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু একটি আবেদনই বার বার নিবেদন করলাম, 'হে আমার আল্লাহ! আমি বয়সের এক প্রান্তে পৌঁছেছি, তোমার কাছে নিবেদন, মৃত্যুর পূর্বে যেনো আমি এই চোখে দেখে যেতে পারি, আমার মাতৃভূমি– প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে তোমার কোরআনের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।'

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকাল ও কবর সম্পর্কে বোখারী শরীফের হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– মালাকুল মাউত যখন হযরত মূসার কাছে তাঁর প্রাণ গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন তখন তিনি তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। মালাকুল মাউত মহান আল্লাহর কাছে গিয়ে আবেদন করেছিলেন, 'আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যিনি মৃত্যুবরণ করতে আগ্রহী নন।' আল্লাহ তা'য়ালা মালাকুল মাউতকে বললেন, 'তুমি তাঁর কাছে গিয়ে বলো, সে যেনো তাঁর একটি হাত গরুর পিঠের ওপরে রাখে। তাঁর হাতের নিচে যতগুলো পশম পড়বে, তার প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে এক বছরের হায়াত সে লাভ করবে।'

মালাকুল মাউত এসে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে সে কথা জানালেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, 'হে আল্লাহ! এই হায়াত তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে। তারপর কি হবে? আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে জানালেন, তারপর মৃত্যুকে বরণ করতেই হবে।' হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, মৃত্যুকে যদি বরণ করতেই হয়, তাহলে আর দেরি করে কি লাভ, এখনই মৃত্যু হয়ে যাক।'

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হযরত মূসা মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন, তাঁকে যেন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দুরত্বে

কবর দেয়া হয়। আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবীদের কাছে বলেছেন, 'যদি আমি সেখানে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের কাছে থাকতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল টিলার নিচে হযরত মূসার কবর দেখিয়ে দিতাম।' (বোখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

তুর পর্বত বা জবলে মূসার পাদদেশে গোলাকার আকৃতির একটি গাছ রয়েছে, এই গাছের নিচের অংশ পাথর দিয়ে বাঁধানো। কথিত আছে যে, এটাই সেই গাছ– যে গাছ থেকেই হযরত মূসা আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখেছিলেন। অনেক মানুষ এই গাছ দেখতে এখানে আসে। তবে হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে সেই গাছ বর্তমানেও জীবিত রয়েছে বা এটাই সেই গাছ কিনা, এ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের ধারণা– সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিপরীত মেরুর লোকদের সমাবেশ

এখানে আরেকটি বিষয় আমার চোখে পড়তেই আমি বিস্ময়ের ধাক্কা খেলাম। একই স্থানে পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ, খৃষ্টানদের জন্য একটি গির্জা এবং ইয়াহূদীদের জন্য একটি সিনাগেগো। এই তিনটি ধর্মীয় স্থান কিন্তু বিরান পড়ে নেই, প্রত্যেহ এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইয়াহূদী ধর্মের লোকজন এসে যার যার উপাসনালয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে ইবাদাত করে থাকে। তাঁরা পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে, একে অপরের সাথে কুশল বিনিময়ও করছে, পরস্পর পরস্পরকে ইবাদাতও করতে দেখছে কিন্তু কোনো ধরনের সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে না।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এই তিনটি ধর্মীয় সম্প্রদায় যদি কিতাবের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারতো, তাহলে অবশ্যই এই সবুজ-শ্যামল পৃথিবী থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, জিঘাংসা ও সংঘাত দূর হয়ে আক্ষরিক অর্থেই এই পৃথিবী শান্তির নিবাসে পরিণত হতো। কারণ খৃষ্টান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় যে দুইজন নবীর অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে দাবী করে থাকে, সে দুইজন সম্মানিত নবী সেই একই কথার দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন, যে কথার দিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পৃথিবীবাসীকে আহ্বান করেছেন। সে কথাটি হলো, 'হে মানুষ! তোমরা একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই।'

এই তিনজন সম্মানিত-মর্যাদাবান নবী-রাসূলের দাওয়াতের মূল কথা একটিই যে, একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকেই ইলাহ্ এবং রব হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং

একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে। খৃষ্টান ও ইয়াহূদীদেরকে বলা হয় আহ্‌লে কিতাব। মুসলিম, খৃষ্টান ও ইয়াহূদী– এই তিন সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এভাবে আহ্বান জানিয়েছেন, 'বলো, হে আহ্‌লি কিতাব! এসো একটি কথার দিকে– যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান, (গ্রহণযোগ্য) তা এই যে, আমরা (উভয়েই) আল্লাহ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কারো শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও নিজেদের রব বলে গ্রহণ করবো না।' (সূরা আলে ইমরাণ-৬৪)

কোরআনের এই আহ্বানের প্রতি যদি খৃষ্টান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় সাড়া দিয়ে মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে কোনোই সমস্যা নেই। কারণ তারাও তো সেই আল্লাহকেই ইলাহ ও রব হিসেবে মানে, যে আল্লাহকে মুসলিম সম্প্রদায়ও ইলাহ ও রব হিসেবে মানে। কিন্তু খৃষ্টান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় এমনই বাধার অনতিক্রমনীয় প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে যে, যা অতিক্রম করে পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এক অসম্ভব বিষয়ে পরিণত করেছে। আর এ কারণেই কেউই পরস্পরের কাছে আসতে পারছে না।

আজ, ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসের ৯ তারিখে আমি এখানে দাঁড়িয়ে মুসলিম, খৃষ্টান ও ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের মিলন মেলার যে দৃশ্য দেখছি, এই দৃশ্য কি সারা দুনিয়াব্যাপী দেখার ব্যবস্থা করা যায় না? বিশ্ব নেতৃত্ব মুসলিম, খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের আকীদা-বিশ্বাস অনুসারে কোরআনের উল্লেখিত আহ্বানের ভিত্তিতে তৎপর হলেই তিন সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে বর্তমানের এই অশান্ত, সংঘাত জর্জরিত ও হিংসা-ঘৃণায় পরিপূর্ণ পৃথিবীকে শান্তির নিবাসে পরিণত করতে পারেন। বিশ্ব নেতৃত্ব বিলাস বহুল অট্টালিকায় বসে পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান, কিন্তু যে সমস্যা সবথেকে প্রকট এবং যার সমাধান করতে পারলে সমস্যা নামক বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হবে, সেই সমস্যার কথা ভুলেও মুখে উচ্চারণ করেন না। অর্থাৎ এই তিন সম্প্রদায়কে কিতবের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা, এ বিষয়ে তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে রয়েছেন।

পৃথিবী থেকে তারা সন্ত্রাস দূর করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছেন। কিন্তু সন্ত্রাস দূর করা তো দূরে থাক, তারা সন্ত্রাস দূর করার জন্য এমন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করছেন যে, সন্ত্রাস ক্রমশ সারা দুনিয়াকে গ্রাস করতে চলেছে। সন্ত্রাস দূর করার

নামে নিজস্ব প্রচার মাধ্যমে সেই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন, যে মুসলিম সম্প্রদায় এই পৃথিবীতে সবথেকে শান্তিকামী এবং পরধর্ম সহিষ্ণু জাতি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাদের প্রতি জুলুম করা হচ্ছে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, নিজ দেশ থেকে উৎখাত করা হচ্ছে, কোথাও এরা ইনসাফ পাচ্ছে না। মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি জুলুম-অত্যাচার নির্যাতন-নিষ্পেষন অব্যাহত রেখে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

হযরত হারুন (আঃ)-এর কবর

ওয়াদিয়ে মুক্কাদ্দাসে তুওয়া অর্থাৎ পবিত্র সেই উপত্যকার সূচনা যেখান থেকে হয়েছে, সেখানেই সামান্য দূরত্বের ব্যবধানে রয়েছে তিনজন সম্মানিত-মর্যাদাবান নবীর মাযার। তাঁরা আমৃত্যু মানুষকে মহান আল্লাহর পথে ডেকেছেন। পরিশেষে মহান আল্লাহর অমোঘ নির্দেশে তাঁরাও মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। মানুষের দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমে আর আখিরাতের জীবনের সূচনা ঘটে কবর থেকে। হযরত সালেহ, হযরত ইলিয়াস ও হযরত হারুন আলাইহিস্ সালামের কবর রয়েছে এখানে। হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম পৃথক কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হননি। তিনি হযরত মূসার আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁরই দোয়ার বরকতে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত হারুনকে সহযোগী নবী নির্বাচিত করেছিলেন।

পবিত্র কোরআনে হযরত মূসার দোয়ায় এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি হযরত হারুনকে নিজের ভাই হিসেবে দোয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু তিনি হযরত মূসার আপন সহোদর ভাই ছিলেন না চাচাত ভাই ছিলেন অথবা অন্য কোনো ধরনের ভাই ছিলেন, এ কথা উল্লেখ করা হয়নি। মিরাজের রাতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনি যখন পঞ্চম আকাশে তখন সেখানে হযরত হারুনের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ইনি হলেন আল্লাহর নবী হারুন, তাঁকে সালাম করুন। (বোখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে তাঁর ওপরে অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিয়ে আদেশ দিলেন, 'এবার যাও, দায়িত্ব পালন করো।' আল্লাহ তা'য়ালা প্রথমে এই দায়িত্ব সাধারণ লোকদের মধ্যে পালন করার আদেশ দিলেন না, সর্বপ্রথমেই আদেশ দিলেন মিসরের সরকার প্রধান ফিরআউনের কাছে

যাবার জন্য। এই দায়িত্ব পালন কোনো সহজ বিষয় ছিল না। যেখানে তাঁকে গিয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছিল। তারপরেও বড় কথা ছিল, তাঁকে প্রেরণ করা হচ্ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে।

সমকালিন পৃথিবীতে সে সরকার ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সমরাস্ত্রে সজ্জিত। বিশাল একটি অনুগত সেনাবাহিনী ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। এ ধরণের একটি সরকারের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ হযরত মূসাকে একা যেতে বলছেন সংগ্রাম করার জন্য। তিনি যেতে অস্বীকার করলেন না বা এ কথাও বললেন না যে, আমি একা একটি সরকারকে কিভাবে মোকাবেলা করবো? আমার সাথে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র এবং বিশাল সেনাবাহিনী দেয়া হোক। এসব কোনো কথাই তিনি বললেন না। কারণ তিনি জানতেন, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ময়দানে আন্দোলনে নামিয়ে দিয়ে বসে তামাশা দেখেন না। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন। তিনি শুধু নিজের একটি দুর্বলতার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করলেন এবং নিজের আত্মীয় হযরত হারুনকে তাঁর সহযোগী হিসেবে কামনা করলেন।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন, 'মূসা বললো, 'হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার জন্য নিজের পরিবার থেকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও আমার ভাই হারুনকে।' (সূরা ত্বা-হা-২৫-৩০)

হযরত মূসা সম্পর্কে মুসলিম সমাজে ইসরাঈলী বর্ণনা প্রচলিত রয়েছে যে, তিনি শিশুকালে ফিরআউনের বাড়িতে আগুন তুলে মুখে পুরে ছিলেন বিধায় তিনি তোতলা হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি তোতলামী দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। এ ধরনের বর্ণনা বা কথার কোনো ভিত্তি নেই। প্রকৃত বিষয় হলো, যে লোক জীবনে কোনো দিন কোনো সমাবেশে বক্তৃতা দেয়নি, সেই লোককে ধরে যদি মঞ্চে উঠিয়ে দিয়ে বক্তৃতা দিতে বলা হয়, তাহলে তো তার হাঁটু কাঁপা আরম্ভ হবে কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে আসবে, তোতলামী করবে এবং এটাই স্বাভাবিক।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম জীবনে কখনো বক্তৃতা দেননি বা এর প্রয়োজনও হয়নি। নবুওয়াতের দায়িত্ব তাঁর প্রতি যখন অর্পণ করা হলো, তখন তিনি এই দায়িত্বের পরিধি সম্পর্কে স্পষ্ট বুঝে ছিলেন যে, কিভাবে এই দায়িত্ব পালন করা

উচিত। মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে হবে এবং সে এমন আকর্ষণীয় ও মর্মস্পর্শী ভাষায় জানাতে হবে যে, তা যেনো মানুষের মর্মমূলে গিয়ে প্রবেশ করে। এর জন্য হতে হবে সর্বোত্তম কথক এবং উত্তম অনলবর্ষী বক্তা। বক্তৃতার অভ্যাস তাঁর ছিলো না বিধায় তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করেদিন, আমি যেনো মানুষকে সর্বোত্তম ভাষা ও পদ্ধতিতে বুঝাতে পারি সেই শক্তি আমাকে দিন।'

সূরা ত্বাহায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর দোয়া সাথে সাথে কবুল করেছিলেন এবং পরবর্তীতে হযরত মূসা সেই যুগের সবথেকে শক্তিশালী কথক ও বক্তার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম হযরত মূসার থেকে প্রায় তিন বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তিনি হযরত মূসার অধীন ও সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনিও নবী ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর নবুওয়াত স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল না। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র কাছে তাকে নিজের সহকারী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে হযরত মূসার সহকারী নির্বাচিত করেন। এই তুর পাহাড়েরই অপরপ্রান্তে আরেকটি ছোট পাহাড় রয়েছে, স্থানীয় জনশ্রুতি মতে এই পাহাড়ে হযরত হারুণ এসেছিলেন, এ কারণে এই পাহাড়ের নাম হারুন পাহাড়।

হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কবর

হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পবিত্র কোরআনে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর আলোচনা এসেছে। সূরা আস্ সাফ্ফাত-এর ১২৩ থেকে ১৩২ আয়াতে এবং সূরা আল আন'আমের ৮৫ আয়াতে। আধুনিককালের গবেষকগণ খৃষ্টপূর্ব ৮৭৫ থেকে ৮৫০ এর মধ্যবর্তী সময়কে তাঁর সময় হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি ছিলেন জিল'আদ-এর অধিবাসী, প্রাচীন যুগে জিল'আদ বলা হতো বর্তমান জর্দান রাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলীয় জিলাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত ইয়ারমুক নদীর দক্ষিণে অবস্থিত এলাকাকে।

কোনো কোনো ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস্ সালামের ইন্তেকালের পরে তাঁর পুত্রের শাসনামলে বনী ইসরাঈল রাজ্য দু'ভাগ হয়ে যায়। একভাগে ছিল বাইতুল মুকাদ্দিস ও দক্ষিণ ফিলিস্তিন। আর উত্তর ফিলিস্তিন সমন্বয়ে গঠিত দ্বিতীয় ভাগটিতে ইসরাঈল নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে

যায়। যদিও উভয় রাষ্ট্রের অবস্থাই ছিল দোদুল্যমান কিন্তু ইসরাঈল রাষ্ট্রে প্রথম থেকেই এমন মারাত্মক বিকৃতির পথে এগিয়ে চলছিল যার ফলে সেখানে শির্‌ক, মূর্তিপুজা, জুলুম, নিপীড়ন, ফাসেকী ও চরিত্রহীনতা ক্রমশ বৃদ্ধিই হচ্ছিলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন ইসরাঈলীদের শাসক আখিয়াব সে সময়ের সাইদা এলাকা-বর্তমান লেবাননের রাজকন্যা ইজবেলকে বিয়ে করে, তখন সেই বিকৃতি ও বিপর্যয় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। মুশরিক রাজকন্যার সংস্পর্শে এসে আখিয়াব নিজেও মুশরিক হয়ে যায়। সে নানা ধরনের মন্দির ও যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে। এক আল্লাহর ইবাদাতের পরিবর্তে মূর্তি পূজার প্রচলন করে এবং মূর্তির নামে বলিদানের ব্যবস্থা করে।

ঠিক এ সময় হযরত ইলিয়াস আলাইহিস সালাম আগমন করেন। তিনি জালআদ থেকে এসে শাসক আখিয়াবকে স্পষ্টভাষায় বলেন, 'তুমি যেভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কাজের প্রসার ঘটাচ্ছো, এ কারণে এই ইসরাঈল রাজ্যে এক বিন্দুও বৃষ্টি হবে না, এমনকি কুয়াসা ও শিশিরও ঝরবে না।'

আল্লাহর নবীর বলা কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো এবং সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলো। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি প্রতিকূলে দেখে শাসক আখিয়াব হযরত ইলিয়াস আলাইহিস্ সালামকে ডেকে পাঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আবেদন জানালো। তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করার পূর্বে ইসরাঈলের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও মূর্তির পার্থক্য সম্পর্কে জানিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এ জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন, 'একটি সাধারণ সমাবেশে বা'আল নামক মূর্তির পূজারী দলও এসে তার উপাস্য দেবতার নামে বলি দিবে এবং আমিও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নামে কুরবানী করবো। দু'টি কুরবানীর মধ্যে থেকে মানুষের হাতে লাগানো আগুন ছাড়াই অদৃশ্য আগুনের মাধ্যমে যেটিই পুড়ে যাবে, সেটি যার নামে উৎসর্গ করা হয়েছিলো, তিনিই উপাস্য হিসেবে গণ্য হবেন।'

শাসক আখিয়াব একথা মেনে নিল। ফলে কারমাল পর্বতে বা'আল নামক মূর্তির ৮৫০ জন পূজারী একত্রিত হলো। ইসরাঈলীদের সাধারণ সমাবেশে তাদের সাথে হযরত ইলিয়াস আলাহিস সালামের মোকাবিলা হলো। এ মোকাবিলায় বা'আল পূজকরা পরাজিত হলো। হযরত ইলিয়াস সকলের সম্মুখে একথা প্রমাণ করে দিলেন যে, বা'আল একটি মিথ্যা উপাস্য এবং প্রকৃত ইলাহ হলেন সেই তিনিই- যিনি এই বিশ্বলোক সৃষ্টি করে পরিচালন ও প্রতিপালন করছেন এবং তিনি সেই আল্লাহর পক্ষ

থেকেই নবী হিসেবে আগমন করেছেন। এরপর তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করার সাথে সাথেই সমগ্র ইসরাঈল রাজ্যে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু এসব মু'জিযা দেখেও স্ত্রৈণ শাসক আখিয়াব তার মূর্তিপূজক স্ত্রীর গোলামী ত্যাগ করতে পারেনি। সে মুশরিক স্ত্রীর পরামর্শে আল্লাহর নবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো, বিষয়টি তিনি জানতে পেরে তিনি তুর পাহাড়ের দিকে হিজরত করেন। পুনরায় কয়েক বছর পর তিনি ইসরাঈলে এসে তাওহীদের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু বিদ্রোহী শাসক ও তার অনুসারীরা আল্লাহর নবীর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। পরবর্তীতে এই শাসকগোষ্ঠী মহান আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়।

হযরত ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আর ইলিয়াসও অবশ্যই রাসূলদের একজন ছিল। স্মরণ করো যখন সে তার জাতিকে বলেছিল, 'তোমরা ভয় করো না? তোমরা কি বা'আলকে ডাকো এবং পরিত্যাগ করো শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগের-পেছনের বাপ-দাদাদের রব?' কিন্তু তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করলো, সুতরাং এখন নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে শাস্তির জন্য পেশ করা হবে, তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া। আর ইলিয়াসের সম্পর্কে সুখ্যাতি আমি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অব্যাহত রেখেছি। ইলিয়াসের প্রতি সালাম। সৎকর্মশীলদের আমি অনুরূপ প্রতিদানই দিয়ে থাকি। যথার্থই সে আমার মু'মিন বান্দাদের একজন ছিল।' (সূরা আস্ সাফ্ফাত-১২৩-১৩২)

হযরত সালেহ (আঃ)-এর কবর

হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর এই নবী এবং তাঁর অবাধ্য জাতির কাহিনী পঠিত হতে থাকবে এবং শিক্ষা গ্রহণকারীগণ শিক্ষা গ্রহণ করে সে অনুসারে পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে আট জায়গায় হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামের নাম উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামকে যে জাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, সে জাতির আদি পুরুষের নাম ছিল সামূদ। এ কারণে এই জাতি ইতিহাসে সামূদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পবিত্র কোরআনেও এই জাতিকে সামূদ জাতি হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামের যুগে আ'দ নামক সম্প্রদায় অবাধ্যতার কারণে মহান আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়েছিলো। তাদের মধ্যে যে কয়জন লোক ঈমান এনেছিলো, সেই ঈমানদার লোকদের থেকে যে জনগোষ্ঠী বিস্তার লাভ করেছিলো, তাদেরকে ইতিহাসে দ্বিতীয় আ'দ নামে পরিচিত করা হয়েছে। এদেরই কোনো শাখা বা গোটা জনগোষ্ঠীকে সামূদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইতিহাসে এ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এরা হলো আরবে বায়েদাহ্ বা বিধ্বস্ত আরবী বংশ।

এই সামূদ জাতির বসবাসের স্থান সম্পর্কে গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ আরবের হিজর নামক এলাকার কথা উল্লেখ করেছেন। সামূদ জাতি আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি যা আ'দ জাতির পরে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিমান ছিল। কোরআন অবতীর্ণ হবার পূর্বে এই জাতি সংক্রান্ত কাহিনী গল্পাকারে আরববাসীর মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। সে যুগের সাহিত্যে, কবিতায় এবং আরবদের কথাবার্তায় এই জাতি সম্পর্কে নানা কথার উল্লেখ দেখা যায়। অসরিয়া প্রস্তর লিপি, গ্রীস, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণও এই জাতির কথা উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে মদীনা ও তাবুকের মধ্যে রেলপথে 'মাদায়েন সালেহ' নামক একটি ষ্টেশন অপস্থিত রয়েছে। এই ষ্টেশনের এলাকা ও তার আশেপাশের এলাকা ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রস্থল। প্রাচীন কালে এই এলাকাকে হিজর বলা হত। বর্তমান সময় পর্যন্ত সেখানে কয়েক সহস্র একর যমীর ওপর সেই পাথুরে কোঠাবাড়িগুলো অতীত ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা সামূদ জাতি পাহাড় খোদাই করে নির্মাণ করেছিল। এই প্রাণ স্পন্দনহীন নির্বাক কোলাহল মুক্ত নগরী দেখে অনুমান করা হয় যে, ইতিহাসের গর্ভে নিমজ্জিত সেই সময়ে সামূদ জাতির জনসংখ্যা খুব কম করে হলেও চার পাঁচ লাখের কম ছিল না।

আরবের ঐতিহাসিকগণ বলেন, সামূদ জাতি অট্টালিকা নির্মাণ শিল্পে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল এবং তাদের যুগের অট্টালিকাগুলো তাদের দ্বারাই নির্মিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুকের প্রান্তরে গিয়েছিলেন, ফিরে আসার পথে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সেখানের প্রাচীন নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছিলেন। এক স্থানে তিনি একটি কূপের চিহ্ন দেখিয়ে বলেছিলেন, এই কূপ থেকেই হযরত সালেহর উট পানি পান করতো। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলেছিলেন, 'তোমরা এই কূপ হতেই কেবল মাত্র পানি পান করবে। অন্য কোন কূপ হতে পানি পান করবে না'। একটি

পাহাড়ী পথ দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই পথ দিয়েই হযরত সালেহ-এর উট পানি পান করতে আসতো। এ কারণে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঐ পথটির নাম 'উটের পথ' হিসাবেই পরিচিত রয়েছে।

যে স্থানে আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিলো, সেখানে কয়েকজন সাহাবা ঘুরাঘুরি করছিলেন। আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে একত্রিত করে জানালেন, 'আল্লাহর অবাধ্য হবার কারণে এই জাতির প্রতি গযব নাযিল হয়েছিলো, এই জাতি থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। এটা হচ্ছে আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া এক জাতির বসতি স্থান। অতএব এখান থেকে যতদ্রুত সম্ভব অগ্রসর হয়ে যাও। এটা ভ্রমণের উপযোগী স্থান নয়। যারা নিজেদের ওপর জুলুম নির্যাতন করেছে তাদের আবাসস্থানে তোমরা প্রবেশ করো না। কাঁন্নাকাটি করতে করতে এ এলাকাটি অতিক্রম করো। তারপর তিনি চাদর দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে নিলেন এবং অতিদ্রুত সেই উপত্যকাটি অীতক্রম করলেন।' (বোখারী)

মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা হূদ-এ হযরত সালেহ আলায়হিস্ সালামের জাতি সামূদদের ইতিহাস মানব গোষ্ঠীর সামনে পেশ করেছে। যেন এই মানুষ ভয়ঙ্কর সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'আর সামূদ-এর কাছে আমি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করলাম। সে বললো, হে জাতির লোকজন! আল্লাহর দাসত্ব কবুল করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদেরকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছেন আর এখানেই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকেই ফিরে এসো। অবশ্যই আমার রব অত্যন্ত কাছে এবং তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দান করেন।' (সূরা হূদ-৬১)

কিন্তু সেই জাতি আল্লাহর নবীর কথায় কান দেয়নি বরং তাঁকে তারা অস্বীকার করে বলেছে, 'তুমি যদি সত্যই নবী হয়ে থাকো, তাহলে অমুক অমুক নিদর্শন দেখাও।' তিনি নিদর্শন দেখিয়েছেন, তবুও সেই অবাধ্য জাতি তাঁর কথা শোনেনি এমন কি আল্লাহর নিদর্শন সেই উটকেও তারা হত্যা করেছে। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি নারাজ হয়ে গযব নাযিল করে এমনভাবে ধ্বংস করে দিয়েছেন যে, ক্ষণপূর্বে যেখানে ছিলো বিশাল বিশাল অট্টালিকা এবং যে এলাকা ছিলো জনকোলাহল মুখর, সেই এলাকা বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছিলো। পবিত্র কোরআনে তাদের ধ্বংসের যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, তা পাঠ করলে শরীরে ভয়ঙ্কর কম্পন সৃষ্টি হয়।

'আর যারা জুলুম করেছিল, এক প্রচন্ড শব্দ তাদেরকে আঘাত হানলো এবং তারা নিজেদের ঘরে এমনভাবে স্পন্দনহীন ও নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলো যেন তারা সেখানে কোনোদিনই বসবাস করেনি। শোন! সামুদ তাদের রবের সাথে কুফুরী করেছে। আরো শোন! দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে সামুদকে।' (সূরা হূদ-৬৭-৬৮)

'তারপর দেখো, আমার আযাব কত ভয়াবহ ছিল এবং আমার সাবধানবাণী ছিল কত ভয়াবহ। আমি তাদের ওপর শুধুমাত্র একটি শব্দ ছেড়েছি, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীদের নিষ্পেষিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ ডাল পালার মতই ভুষি হয়ে গেল।' (সূরা কামার-৩০-৩১)

কোরআনের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, এই জাতিকে অনেক ওপরে উঠিয়ে যমীনের ওপরে আছাড় দিয়ে ফেলা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারপর যারা সামুদ জাতি ছিল, তাদেরকে আমি উর্ধ্বে উঠিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি।' (সূরা আল্ হাক্কাহ্-৫-৬)

এই সূরা আল হাক্কাহ্-তেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই জাতির ওপরে সাতদিন এবং আট রাতব্যাপী একটানা ধ্বংস যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আল্লাহর কোরআন বলছে, খেজুর গাছের শাখা শুকিয়ে গেলে যে অবস্থা ধারণ করে, তাঁদের অবস্থাও অনুরূপ হয়েছিলো। এভাবে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে আ'দ ও সামুদ জাতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন। শুধু তারাই নয়, অতীতে যেসব জাতি আল্লাহর বিধানের সাথে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে, তারপর তারা কিভাবে আল্লাহর গযবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, সেসব ইতিহাস আল্লাহ মানুষকে শুনিয়েছেন। মানুষ যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মহাধ্বংস থেকে নিজেরদের হেফাজত করে। আল্লাহর গযবে সেসব বিদ্রোহী জাতি কিভাবে ধ্বংস হয়েছিলো, তা কিছুদিন পূর্বে ঘটে যাওয়া 'সুনামী'র ধ্বংস যজ্ঞের দিকে দৃষ্টি দিলেই কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে হযরত সালেহ্ আলাইহিস্ সালাম এই এলাকাতে আল্লাহর গযবে নিপতিত সামূদদের অঞ্চল থেকে হিজরত করে এসে পৌছেছিলেন। বর্তমানে তাঁর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ওয়াদিয়ে মুকাদ্দাসে রয়েছে উল্লেখিত তিনজন সম্মানিত নবীর মাযার। যিয়ারত করার জন্য তাঁদের মাযারের পাশে যখন দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন মনের মধ্যে এক ভিন্ন অনুভূতির

সৃষ্টি হয়েছিলো। এই সেই তিনজন মহামানবের কবর, যাঁরা এখানে অন্তিম শয়নে শায়িত, তাঁরা ছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত নবী-রাসূল। আল্লাহ বিরোধিদের সাথে তাঁরা সংগ্রাম মুখর জীবন-যাপন করেছেন।

সারাটি জীবন মানুষকে মহান আল্লাহর পথে ডেকেছেন এবং সবশেষে তাঁরা এই তুর পাহাড়ের পবিত্র উপত্যকায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন। মিসরের উত্তর-পূর্বাংশে তুর পাহাড় বা সাইনা উপত্যকা প্রায় ৬১,০০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত। এর আয়তন শুধু মিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়– মুসলিম বিশ্বের বিষফোঁড়া ইসরাঈলেও এর সীমানা স্পর্শ করেছে। অসমতল ত্রিভূজ আকৃতির সাইনা পর্বতের দক্ষিণে লোহিত সাগর, দক্ষিণ-পূর্বে আকাবা এবং পশ্চিমে ইসরাঈলের নেগেভ মরুভূমি এবং সুয়েজ খাল। সাইনা পর্বতের দুইটি দিকের মধ্যে দক্ষিণে জবলে মূসা বা মূসার পর্বত ও উত্তর দিকে ফিলিস্তিনের গাজা শহর– যেখানে ইসরাঈলীদের আজরাঈল মুক্তিযোদ্ধা হামাসের ঘাঁটি। জবলে মূসার উচ্চতা প্রায় ২৬৭৩ মিটার এবং এটাই তুরে সাইনা ও মিসরের সর্বোচ্চ ভূমি। সাইনা পর্বত এলাকা আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভূমি সেতু হিসেবে বিদ্যমান।

চিরন্তন সেই ১২ টি ঝর্ণা

পরম আকর্ষণীয় এই স্থানে এসে যেনো ক্ষুধার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। সাধারণত আমি যোহরের নামাযের পর পরই দুপুরে খাবার গ্রহণ করি। কিন্তু আজ এখানে এসে বেলা তিনটা বেজে গিয়েছে। সাথের একজন খাবারে কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই অনুভব করলাম বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। কাছেই একটি সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে হালকা কিছু খাবার গ্রহণ করে কায়রোর দিকে ফেরার প্রস্তুতি নিলাম। সাধ্য অনুযায়ী সেখানে যা কিছু রয়েছে তা দেখলাম এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করলাম। এবার ফেরার পালা– মনটা বড়ই বিষন্ন হয়ে গেলো। এই সেই স্থান ছেড়ে যাচ্ছি, যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নূরের তাজাল্লি নিক্ষেপ করেছিলেন। যে স্থানকে পবিত্র উপত্যকা হিসেবে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ধন্য হয়েছিলো এই পর্বত মহান আল্লাহর নূরের পরশ পেয়ে এবং আমরাও হয়েছি, সেই স্থান দু'নয়ন ভরে দেখার সুযোগ পেয়ে।

আর কবে কোনো দিন এখানে আসা হবে কিনা– এ প্রশ্নের জবাব ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে। ফেরার জন্য যখন গাড়িতে উঠে বসলাম, তখন নিজেকে আর রোধ করতে পারলাম না। শিশুর মতো চিৎকার করে কাঁদার বয়স নেই, কিন্তু নিজের অজান্তেই দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা। বুকের মধ্যে অনুভব করলাম, আমি যেনো

চিরদিনের মতোই এখানে পরম এক আপনজনকে ছেড়ে যাচ্ছি। গাড়ি ছুটে যাচ্ছে সুয়েজ খালের দিকে, তবুও পেছন ফিরে বার বার সেই পবিত্র উপত্যকা শেষবারের মতোই দেখার দুর্দমনীয় ইচ্ছা রোধ করতে পারিনি। চোখের গোলক জুড়ে বার বার পবিত্র স্থানসমূহের চিত্র ভেসে উঠছে আর বুকের মধ্যে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। এখানের এই পবিত্র স্মৃতিসমূহ যেমন অনেকদিন ধরে আমার মন-মানসিকতায় জান্নাতী এক শিহরণ জাগাবে, তেমনি এখানে পুনরায় আসার জন্য আমাকে লোভাতুর করে তুলবে।

সুয়েজ খালের কাছাকাছি আসতেই সেই স্থানের দেখা পেলাম, যেখানে মহান আল্লাহর নির্দেশে কুদরতি ঝর্ণার সৃষ্টি হয়েছিলো। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মিসর থেকে কয়েক লক্ষ বনি ইসরাঈলীদের নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ১২ টি গোত্র ছিলো। নির্জন মরুপ্রান্তর, কোথাও কোনো বৃক্ষ তরুলতার চিহ্ন নেই। খাদ্য-পানিয় নেই এবং মাথার ওপরে উন্মুক্ত আকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই। জালিম ফিরআআউনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রায় ২০ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক ও বৃদ্ধ মানুষ মহান আল্লাহর নবীর নেতৃত্বে মিসর থেকে হিজরত করে নির্জন এই মরুপ্রান্তরে এসে নিয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মহান আল্লাহ তা'য়ালা বেশ কয়েক স্থানে বনী ইসরাঈলীদের প্রতি তাঁর অসীম করুণার কথা উল্লেখ করেছেন। জন-মানবহীন এই মরুপ্রান্তরেও আল্লাহ তা'য়ালা তাদের প্রতি অসীম করুণা করেছিলেন। পানির অভাবে যখন তাদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, তখন তারা হযরত মূসার কাছে পানির জন্য আবেদন জানালো। আল্লাহর নবী আবেদন জানালেন মহান আল্লাহর কাছে। এ ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'স্মরণ করো, মূসা যখন নিজ জাতির লোকদের জন্য পানি প্রার্থনা করলো, তখন আমি বললাম, 'অমুক কঙ্করময় ভূমির ওপর তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত করো।' এর ফলে উক্ত স্থান থেকে বারটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হলো এবং প্রত্যেক গোত্রই নিজ নিজ পানি গ্রহণের স্থান জেনে নিলো।' (সূরা আল বাকারা-৬০)

বনী ইসরাঈলীরা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কাছে পানির আবেদন জানালে তিনি মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে হাতের লাঠি দিয়ে প্রস্তর খন্ডে আঘাত করতে বললেন, তিনি আঘাত করার সাথে সাথে পাথর খন্ড থেকে ১২ টি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে থাকলো। বনী ইসরাঈলীদের ১২ টি গোত্র

কে কোন্ ঝর্ণা থেকে পানি সংগ্রহ করবে, তা তারাই ঠিক করে নিলো। এরপর এলো রোদ-বৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার ও খাদ্যের প্রশ্ন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা সে ব্যবস্থাও করলেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, 'মূসার জাতির লোকেরা যখন মূসার কাছে পানি চাইলো তখন আমি তাদেরকে ইশারা করলাম যে, অমুক প্রস্তরময় ভূমির ওপর তোমার লাঠি দিয়ে আঘাত করো। ফলে সেই প্রস্তরময় ভূমির বুক থেকে ১২ টি ঝর্ণাধারা উৎসারিত হলো এবং প্রত্যেকটি দল পানি নেয়ার জন্য জায়গা ঠিক করে নিলো। আমি তাদের ওপর মেঘের ছায়া বিস্তার করে দিলাম এবং তাদের জন্য মান্না ও সালওয়া নাযিল করলাম। আর বললাম, খাও সেই পবিত্র জিনিসসমূহ– যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি।' (সূরা আল আ'রাফ-১৬০)

কোরআনের মুফাস্সীরগণ বলেন, মান্না ও সালওয়া এক ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্য। বনী ইসরাঈলী জাতি তাদের সেই বাস্তুহারা জীবনে একটানা দীর্ঘ ৪০ বছরব্যাপী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই উপত্যকায় পেয়েছিলো। রোদ-বৃষ্টি থেকে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে মুক্ত রেখেছিলেন মাথার ওপর মেঘের ছায়া দিয়ে। এ ধরনের অসংখ্য নে'মাত দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ধন্য করেছিলেন।

কিন্তু সেই জাতি বার বার আল্লাহর বিধানের সাথে্য বিদ্রোহ করেছে এবং অসংখ্য নবী-রাসূলকে তারা হত্যা করেছে। এসব শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গযবে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। বনী ইসরাঈলী তথা ইয়াহূদী জাতি সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি আমার লেখা তাফসীরে সাঈদী– সূরা ফাতিহার তাফসীরে।

নিজ চোখে দেখলাম সেই স্থান, যেখানে পাহাড়ী পাথর খন্ড ফেটে ১২ টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়েছিলো। মহান আল্লাহর কুদরত ও হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের মু'যিজা চিরন্তন হয়ে রয়েছে মিসরের বুকে। আল্লাহ তা'য়ালার অসীম রহমতে যেখান থেকে পানির ঝর্ণাধারা নির্গত হয়েছিলো, সে স্থান দেখে সুয়েজ খাল অতিক্রম করে গাড়ি ছুটে চললো মিসরের রাজধানী কায়রোর দিকে। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকলো সেই পবিত্র উপত্যকায়– যে উপত্যকা মহান আল্লাহর নূরের স্পর্শে ধন্য হয়েছিলো।

অনেক পথ পাড়ি দিয়ে যখন কায়রোর আব্বাসিয়া এলাকায় বাসায় পৌঁছলাম, তখন ঘড়িতে সময় সঙ্কেত দিচ্ছিলো রাত সাড়ে আটটা। সেই কাকডাকা সকালে বের

হয়েছি আর ফিরছি রাতের প্রথম প্রহরে। সারা দিন বিশ্রামের কোনো সুযোগ মেলেনি। ক্লান্তিতে সারা শরীর ভেঙে পড়ছিলো। দ্রুত খাওয়া শেষ করে নামায আদায় করে বিছানায় গেলাম। আজ এক বিশেষ অনুভূতি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শান্তির বাহন ঘুম

আজ তারিখ ১০/০৪/২০০৫, গতকালের লম্বা সফরের ক্লান্তির কারণে আজ ফজরের নামায আদায় করে আবারো ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় দেড় ঘন্টা ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, তখন নিজেকে ক্লান্তি মুক্ত অনুভব করলাম। এই ঘুম সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, 'তোমাদের জন্য ঘুমকে শান্তির বাহন করেছি।' (সূরা আন্ নাবা-৯)

মহান আল্লাহর এই কথা কতো বাস্তব– তা আবারও অনুভব করলাম। পৃথিবীতে মানুষকে কর্মক্ষম, সচল ও কর্মোপযোগী বানিয়ে রাখার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যে সৃষ্টি কুশলতা সহকারে মানুষের জন্ম প্রকৃতিতে ঘুমের অমোঘ দাবী ও চাপ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, এ কারণেই সে একটানা ৮, ১০, ১২ বা ১৬ ঘন্টা পরিশ্রম করার পর ক্রমাগত কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মানুষ এই পৃথিবীতে সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত পরিশ্রম করতে পারে না। বরং প্রত্যেকবার কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর তাকে কয়েক ঘন্টা বিশ্রাম গ্রহণ করতে হয়। এই বিশ্রামের মধ্য দিয়ে সে পুনরায় কয়েক ঘন্টা শ্রম দেয়ার শক্তি অর্জন করে।

মহাবিজ্ঞানী ও করুণাময় আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র ক্লান্তির অনুভূতি এবং কেবলমাত্র বিশ্রামের আকাংখা সৃষ্টি করেই বিরত হননি বরং ঘুমের এমন একটি শক্তিশালী চাহিদা মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন যার ফলে মানুষের ইচ্ছা ব্যতীতই এমন কি তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কয়েক ঘন্টার জাগরণ ও পরিশ্রমের পর ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজনিয়তা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। এই ঘুম বা বিশ্রামের প্রয়োজনিয়তা শেষ হলেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষকে ত্যাগ করে। এই ঘুমের স্বরূপ ও অবস্থা এবং মৌল কারণগুলো বর্তমান সময় পর্যন্তও মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি।

এটা অবশ্যই জন্মগতভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এবং সৃষ্টি কাঠামোতে প্রবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এটা যথাযথভাবে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে হয়ে থাকে, বিষয়টি এ কথার প্রমাণ দেয় যে, পরিশ্রমের পরে বিশ্রামের প্রয়োজনিয়তা ও ঘুম কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় বরং মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টা একটি নির্ভূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এই অবস্থা সৃষ্টি করেছেন।

বিশ্রামের প্রয়োজনিয়তা ও ঘুম এ কথার সাক্ষী দেয় যে, যিনি মানুষের প্রকৃতিতে এই বাধ্যতামূলক উদ্যোগ প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন, তিনি নিজেই মানুষের জন্য তার চেয়ে বেশী কল্যাণকামী। বিশ্রামের অনুভূতি ও ঘুমকে যদি তিনি বাধ্যতামূলক না করতেন, তাহলে এই মানুষ জোরপূর্বক জেগে থেকে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করে নিজের কর্মশক্তি ও প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বানিয়েছেন এ জন্য যে, এ সময় যেন তাঁর প্রিয় বান্দারা আলোর চাকচিক্য থেকে মুক্ত অবস্থায় পরম প্রশান্তির সাথে আরামদায়ক নিদ্রা উপভোগ করতে পারে। আর দিনকে আলোয় আলোকিত করেছেন এ জন্য যে, এই সময় তাঁর বান্দারা যেন ভীতিহীন চিত্তে জীবিকার্জনের লক্ষ্যে মনোসংযোগ করতে সক্ষম হয়।

আজকের খানা তৈরীর দায়িত্বে ছিলো চাঁদপুরের বেলাল, শরীয়াত পুরের আব্দুর রাকীব, ঢাকা– যাত্রাবাড়ীর কাজী মোশাররফ। এরা সবাই আল আযহারের উছূলুদ্দীনের ছাত্র। চমৎকার রান্না ও সুন্দর পরিবেশনায় এরা সকলেই খুবই দক্ষ। আজকের পরিবেশ বেশ ঠান্ডা, গোসল সেরে মৌসুম উপযোগী পোশাক পরে নাস্তার টেবিলে এলাম। নাস্তা করতে করতে লক্ষ্য করলাম, আমাদের গাইড আব্দুল কাদের এসে উপস্থিত। সে জানালো, নীচে গাড়ি ও সফর সঙ্গীরা প্রস্তুত। সকাল ন'টা ৪৫ মিনিটে বাসা থেকে বের হয়ে পড়লাম। আজ আমরা সফরে যাবো মিসরের ঐতিহাসিক শহর ঈস্কান্দারিয়ায়।

ঈস্কান্দারিয়ার পথে

মুসলমানদের অবদান গোপন করা, মুসলিম আবিষ্কারক ও মুসলিম এলাকার নাম বিকৃত করা এবং মুসলিম বিজ্ঞানী কর্তৃক আবিষ্কৃত জিনিসসমূহ নিজেদের নামে চালানো– এটা ইসলামের দুশমনদের বহু পুরোনো এক ঘৃণ্য নীতি। যেমন হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের নাম বিকৃত করে তারা 'ডেভিড', হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে 'জোসেফ' হযরত দানিয়েল আলাইহিস্ সালামের নাম 'ড্যানিয়েল' হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের নাম 'জেসাস ক্রাইষ্ট, বীজ গণিতের আবিষ্কারক আল খাওয়ারিজমীর নাম 'গরিটাস বা আল গরিদম, রসায়ন বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ানের নাম 'জিবার' পদার্থ বিজ্ঞানী ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল কিন্দীর নাম 'কিন্ডাস' জ্যোতির বিজ্ঞানী আবুল মাসারের নাম 'মাসের' কাগজের আবিষ্কারক ইউসুফ ইবনে ওমরের নাম বিকৃত করে 'উমট' হিসেবে পরিচিত করার জন্য উল্লেখ করেছে।

বিজ্ঞানী আব্দুল্লাহ আল বাত্তানীর নাম 'বাতেজনিয়াজ' চিকিৎসা বিজ্ঞানী আর রা'সীর নাম 'রাজাম' জ্যোতির বিজ্ঞানী আল যারকালীর নাম 'মারজাকেল' চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ইবনে সিনার প্রকৃত নাম হলো আবু আলী আল হুসাইন, তাঁর নাম বিকৃত করে করা হয়েছে 'জালিনুস' পদার্থ বিজ্ঞানী আল ইউসুফ আল ঘুরীর নাম বিকৃত করে 'জোসেফ টি প্রিজড' হিসেবে উল্লেখ করেছে। মুসলমানদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহের নাম যেমন, জাবালুত্ তারেক, এই নাম বিকৃত করে 'জিব্রালটার', দারুস সালামকে করেছে 'জেরুমালেম বা যেরুশালেম', বায়তুল্লাহামকে করেছে 'বেথেলহাম' ইত্যদি।

তেমনি মিসরের দ্বিতীয় বন্দর নগরী ঐতিহাসিক শহর ঈস্কান্দারিয়া-কে ইউরোপিয়ানরা বিকৃত নাম দিয়েছে 'আলেকজান্দ্রিয়া বা এ্যালেক্স। মনের গহীনে সাম্প্রদায়িকাতর বিষবাষ্প কতটা পূঞ্জিভূত থাকলে এ ধরনের হীনম্মন্যতা দেখাতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

কায়রো থেকে ঈস্কান্দারিয়া ২২৫ কিলোমিটার দূরে এবং এই শহর এক সময় পরিচিত ছিলো The pearl of the Mediterranean হিসেবে। এই শহরে হযরত লূকমান ও হযরত দানিয়েল আলাইহিস্ সালামের কবর ছাড়াও আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহভীরু সম্মানিত লোকদের কবর রয়েছে। হযরত লূকমান সম্পর্কে আমি আমার লেখা তাফসীরে সাঈদী– সূরা লূকমানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হযরত দানিয়েল আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে কোরআনের গবেষকদের অভিমত হলো, তিনি রাসূল ছিলেন না– নবী ছিলেন। ইয়াহূদী ও খৃষ্টান তথা আহলে কিতাবীরা তাঁকে নবী বলে থাকেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, 'এর পূর্বে আমি সেই রাসূলগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করেছি আর সেই রাসূলগণের প্রতিও ওহী প্রেরণ করেছি, যাদের কথা তোমার কাছে উল্লেখ করিনি।' (সূরা নেসা-১৬৪)

হযরত দানিয়েল আলাইহিস্ সালামসহ আরো অনেক নবী-রাসূল রয়েছেন, যাদের কথা কোরআনে কারীমে উল্লেখ করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করা হয়নি। তবে ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের তথা আহলে কিতাবীদের কিতাবে অনেক নবী-রাসূলদের নাম দেখতে পাওয়া যায়। আহলে কিতাবীদের বর্ণনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আহলে কিতাবীদেব বর্ণনা যাচাই-বাছাই ছাড়া সত্যও মনে করোনা বা মিথ্যাও মনো করোনা।'

তবে কাসাসুল আম্বিয়া নামক কিতাবে অন্য আরেক হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। সে হাদীসের বর্ণনা হলো, বনী ইসরাঈলীদের বর্ণনা কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে গ্রহণ করা যাবে, তবে আহ্কাম ও আকীদার ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত গ্রহণ করা যাবে না।

কায়রো শহর থেকে ঈস্কান্দারিয়া শহরে যাবার দুটো প্রধান সড়ক পথ রয়েছে। এর একটি হলো কোস্টাল রোড ও অপরটি হলো এগ্রিকালচারাল রোড। শহর থেকে বের হয়ে আমাদের চোখে পড়লো গিজার পিরামিডের সুউচ্চ চূড়া। রাস্তার দুই পাশে বিস্তীর্ণ মরুভূমি জুড়ে বানানো হয়েছে বাড়ি-ঘর এবং রোপন করা হয়েছে নানা ধরনের বৃক্ষ। দূরের নীলনদ থেকে পানি সেচের মাধ্যমে গাছগুলোয় পানি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ কিছু দূর এগিয়ে দেখলাম বিশাল কমলা, আম, আপেল, খেজুর ও কলার বাগান। শুধু তাই নয়– নানা ধরনের সব্জী ও অন্যান্য ফলের বাগানও করা হয়েছে। এসবই করা হয়েছে সরকারীভাবে প্রকল্প গ্রহণ করে। ফসল ফলানোর জন্য মাটি এনে ফেলা হয়েছে মরুভূমির বালির ওপরে এবং দীর্ঘ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ঠিক রাখা হয়েছে। নয়নাভিরাম দৃশ্য আমাকে ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়ে দিলো যে, মিসর একটি মরুভূমির দেশ।

এই শহরের সাথে যেমন জড়িয়ে রয়েছে নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহভীরু লোকদের নাম, তেমনি জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের কুখ্যাত ও স্বনাম ধন্য লোকদের নাম। গ্রীক বীর আলেকজান্ডার, রোম সম্রাট সিজার, রাণী ক্লিওপেট্রা, মার্ক এন্টনিও, অক্টোভিয়ান, হাইপেশিয়া, সেইন্ট পল, সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টসহ অনেকের নাম এ শহরের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। দুনিয়ার অন্যতম আশ্চর্য বাতিঘর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্যা ব্যাটেল অব আলামীন-সহ অনেক স্মারকের সাক্ষী এই শহর।

পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এই শহরে এবং ৫ লক্ষ বই ছিলো এখানে। বর্তমান মিসর সরকার এই লাইব্রেরীটি পুনর্নির্মাণ করেছে। এই শহর এক সময় প্রাচীন বিশ্বের শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিলো। এখানে রয়েছে বাদশাহ্ ফারুকের রাজপ্রাসাদ এবং অবকাশ যাপন পার্ক, সমুদ্র সৈকত ও রোমান মিউজিয়াম।

১৯ শতক থেকে এই ঈস্কান্দারিয়া নগরী পরিণত হয়েছে মিসরের নৌ-বন্দর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, এই শহরটি পানির ওপর

ভাসমান একটি শহর। কারণ সমুদ্র উপকূলে গড়ে উঠেছে আধুনিক ঈস্কান্দারিয়া শহর। এই শহরে ট্রাম চলাচলের ব্যবস্থা রয়েছে। এই শহরে মুসলিমদের জন্য বর্তমানে ১,৮১৯ টি মসজিদ ও খৃষ্টানদের জন্য ৩৫ টি চার্চ রয়েছে।

শহরে প্রবেশের সময় লক্ষ্য করলাম, হাতের বাম দিকে ভূমধ্যসাগর এবং ডানদিকে শহর। সমুদ্র উপকূলে পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে সুরম্য অট্টালিকা। সমুদ্রের তীর ঘেষে যে রাস্তা রয়েছে, সে রাস্তার ধারে রয়েছে হোটেল-মোটেল, রেস্তোরা, আবাসিক ভবন ও নানা ধরনের বিপনী কেন্দ্র। আল আযহারের ছাত্রদেরকে ৬/৭ দিনের জন্য বছরে একবার এখানে শিক্ষা সফরে আনা হয়। মিসরে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ এখানে অবকাশ যাপনের জন্য বাড়ি করেছেন। গ্রীষ্মকালেই এখানে পর্যটকদের ভীড় হয়ে থাকে।

ভূমধ্য সাগরের পাড়ে অবস্থিত এই শহরটি চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক মনোরম শহর। নগরীর রাস্তাগুলো আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে যেমন পরস্পরের সাথে সমকোণে নির্মাণ করা হয়েছে, এই শহরেও সেই পদ্ধতিতেই রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তার দুইপাশে দুবাই আবুধাবীর রাস্তার দুইপাশের মতো নানা ধরনের ফুলের বাগান তৈরী করা হয়েছে এবং এসব বাগানে বিচিত্র রঙের ফুলের সমারোহ। রঙ-বেরঙের ফুলের মন-মাতানো গন্ধ এসব পথের পথিকদের নাসিকা স্পর্শ করে যাবে। ঈস্কান্দারিয়া শহরের কোনো কোনো এলাকা আধুনিক লন্ডন শহরের মতো।

পথে সেই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা

রাজধানী শহর কায়রো থেকে বের হয়ে একটানা দেড় ঘন্টা চলার পর প্রধান সড়কের পাশে এক সার্ভিস সেন্টারের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো। আমাদের মিসরীয় ড্রাইভার আব্দুর রউফ এখানে চা পানের উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করলো। আমরা সকলেই নেমে পড়লাম, খুবই চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সার্ভিস সেন্টার। সবকিছুই সাজানো-গোছানো, পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতোই সুন্দর পরিবেশ। পারিপাটি পোশাকে সুসজ্জিত ওয়েটার। আমরা নামতেই আমাদের দিকে দিকে তাঁরা এগিয়ে এলো, বিনয়ের সাথে বিশুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় জানতে চাইলো আমরা কি খেতে ইচ্ছুক।

এখানে প্রত্যেক টেবিলের জন্য নির্দিষ্ট ওয়েটার রয়েছে। আমরা যে টেবিলে বসলাম, সেই টেবিলের জন্য যে ভদ্রলোক নির্দিষ্ট ছিলেন, তাঁর কথা-বার্তায় বেশ আকর্ষণীয়

ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে মনে হলো। সুন্দর চেহারার অধিকারী ভদ্রলোকের পরনে কেতাদুরস্ত পোশাক, সার্ট-প্যান্ট ও টাই পরিহিত লোকটির মুখমন্ডল ক্লিন সেভ। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হাসিমুখে সার্ভিস দিচ্ছেন। নামের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে তিনি জানালেন, তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। তিনি তাঁর পরিচয় পত্র যখন দেখালেন, তখন তো আমাদের সকলেরই ভিম্‌রি খেয়ে পড়ার যোগাড় হলো। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না। এ-ও কি সম্ভব! মিসরের এই মরুভূমির মধ্যে এক সার্ভিস সেন্টারের ওয়েটার পৃথিবীর নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক এবং ইসলামী চিন্তাবিদ!

আব্দুল্লাহ নামের সেই ওয়েটার ভদ্রলোক পৃথিবী বিখ্যাত মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং সরকারের অনুমতিক্রমে তিনি বিভিন্ন মসজিদে বক্তব্য রাখেন। অবকাশকালীন সময়ে তিনি বাড়তি উপার্জনের জন্য পর্যটকদের জন্য নির্মিত সার্ভিস সেন্টারে ওয়েটারের কাজ করেন। আমি ভাবছিলাম, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে হলে যে ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, এই ভদ্রলোকের তা রয়েছে এবং নিশ্চয়ই তাঁর নামের পূর্বে অনেকগুলো ডিগ্রী রয়েছে। এমন একজন মানুষ হালাল পথে বাড়তি উপার্জনের জন্য একটি সার্ভিস সেন্টার তথা রেস্টুরেন্টের ওয়েটারের মতো ছোট কাজ করতে দ্বিধা করছে না। প্রয়োজনে বাড়তি উপার্জনের জন্য বৈধ যে কেনো কাজ করা যেতে পারে, এতে কোনোই লজ্জা নেই।

লজ্জা তো চুরি ও ভিক্ষা করা এবং অন্যের কাছে হাত বাড়ানোর মধ্যে। লজ্জা রয়েছে চাঁদাবাজি, মাস্তানী ও পেশীশক্তি প্রদর্শন করে অন্যের অর্থ-সম্পদ নিজের পকেটস্থ করার মধ্যে। আল আযহারের ডক্টরেট ডিগ্রীর অধিকারী সেই শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের সকলের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেলো। আর ঘৃণা জাগলো আমার দেশের সেই সব লোকদের প্রতি, যারা ঘুষ খায়, চুরি করে– সে চুরি ছিঁচ্‌কে চুরিই হোক আর ক্ষমতার মসনদে বসে কলমের খোঁচায় পুকুর চুরিই হোক। ক্ষণিকের জন্য আমার মন চলে গেলো আমার প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে। আমাদের কি নেই, স্বাধীন দেশ রয়েছে, মাটি ও মানুষ দুটোই রয়েছে। আর আমার দেশের মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসহ এই মিসরকেও দেখছি, পাথর সরিয়ে মাটি বের করে অথবা দূর-দূরান্ত থেকে মাটি এনে মরুভূমির বালির ওপর বিছিয়ে পানির ব্যবস্থা করে

তারপর ফসল ফলানো হয়। এগুলো যারা করে তারাই বোঝে এ কাজ কত কষ্টের। আর আমার দেশে সর্বত্রই মাটি আর মাটি, আঙ্গুলের চাপে মাটির মধ্যে বীজ লাগালেই গাছ গজিয়ে ফসল ধরে। আমার দেশে রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস, পশুসম্পদ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, নদী-নালায় খালবিলে হাত দিলেই সম্পদ আর সম্পদ। আল্লাহ তা'য়ালা দয়া করে আমাদের যে কত সম্পদ দিয়েছেন, তা গুণে শেষ করা যাবে না। প্রয়োজন শুধু এসব সম্পদের উত্তম ব্যবহার এবং কর্মীর হাত।

কাজ ছোট হয়েছে তো কি হয়েছে, বৈধ কাজের মধ্যে ছোট আর বড়তে কোনোই পার্থক্য নেই। আমার দেশের একশ্রেণীর কিশোর-তরুণরা এসএসসির ঘর অতিক্রম করার পূর্বেই এদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ যেনো ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে থাকে। বাজারে ব্যাগ নিয়ে বাপের সাথে যেতেও এদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে। কাজ ছোট হোক বা বড় হোক, এর মধ্যে কোনো লজ্জা নেই, এ কথা যদি আমার দেশের যুবকরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো, তাহলে শ্বশুরের ঘাড়ে চড়ে বা বাপের হোটেলে ফ্রী খেয়ে গ্লানীর বোঝা বহন করতো না। অথবা তারা ছিন্‌তাই, রাহাজানি, ডাকাতি এবং চাঁদাবাজির মতো ঘৃণ্য কাজে জড়িয়ে পড়তো না। আমার দেশে কাজের অভাব নেই- অভাব তো শুধু কাজের লোকের।

সিঙ্গাপুরের মতো ছোট্ট একটি দেশেও আমি নিজের চোখে দেখেছি, কিশোর, তরুণ ও যুবকের দল স্কুল ড্রেস পরিহিত অবস্থায় ঘন্টা হিসেবে কোনো রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের কাজ করে। স্কুল-কলেজ ছুটির পরে তারা আড্ডা দিতে বের হয় না, ওরা কাজ পাগল বলেই তো উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে। সহজে অর্থ উপার্জনের মানসিকতা, ছোট কাজের প্রতি অকারণে ঘৃণা ও কাজের প্রতি উন্নাসিকতাই সম্পদের প্রাচুর্যতা থাকার পরও আমাদের দেশ ক্রমশ অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই ঘৃণ্য মানসিকতার কারণেই তরুণ-যুবকরা সামান্য পয়সার বিনিময়ে রাজনৈতিক দলের লেজুর বৃত্তি করে থাকে। মাত্র কয়েকটি টাকার জন্য এরা রাজনৈতিক দলের মিছিলে ভাড়া খাটে এবং নেতাদের নির্দেশে যান-বাহন ভাঙচুর করা থেকে শুরু করে অফিস-কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন জ্বালায়। সহজে অর্থ উপার্জনের নেশায় এরা হত্যা ও বোমাবাজির মতো নিন্দনীয় কাজে নিজেকে জড়িত করে। জানিনা, কবে আসবে সেদিন- যেদিন আমার দেশের যুবকরা কাজকে কাজই বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে- ছোট আর বড় কাজে পার্থক্য করবে না।

আমাকে অন্য মনস্ক দেখে খন্ডকালীন সময়ে রেস্টুরেন্টের ওয়েটার হিসেবে কর্মরত আল আযহারের সম্মানিত শিক্ষক মুহ্‌তারাম আব্দুল্লাহ আমাকে তাঁর কথার দিকে

আকৃষ্ট করে বললেন, 'ইউরোপ-আমেরিকা দুনিয়ার মুসলমানদের চোখ ধাঁধানো জাগতিক ভোগ-বিলাসের দিকে আকৃষ্ট করে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই।' মন চাইছিলো, লোকটির জ্ঞানগর্ভ কথা শুনি, কিন্ত সময় স্বল্পতার কারণে তা আর হলো না, গাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম।

আলেম সমাজ-বিষয়টি ভেবে দেখবেন কি?

সম্মানিত ওলামা সমাজ! অবকাশকালে রেস্টুরেন্টে যিনি ওয়েটারের কাজ করছেন, তিনি কোরআন-হাদীসে পন্ডিত ব্যক্তি। আধুনিক শিক্ষার উচ্চ ডিগ্রী তিনি গ্রহণ করেছেন এবং আল আযহারের মতো বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি দেশের বিভিন্ন মসজিদে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন এবং শিক্ষিত শ্রোতাগণ তাঁর বক্তৃতা শোনে। এ কাজ তিনি মিসর সরকারের নির্দেশেই করে থাকেন। মুখে দাড়ি নেই, পরনে সুন্নতি পোশাকও নেই। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, 'কাজ ছোট হোক বা বড় হোক, বৈধ হলে লজ্জার কিছু নেই' এটা কিভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন!

পীরে ছেলে পীর হয়ে বাপের রেখে যাওয়া গদীতে বসে মুরীদদের টাকার দিকে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকা অথবা তাবিজ লিখে, মিলাদ পড়ে ও মৃতদের আত্মীয়-স্বজনের ডাকে কোরআন খতম দিয়ে পর নির্ভরশীল জীবন-যাপনের চাইতে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত শিক্ষকের পথ অনুসরণ করলে সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে বৈ কমবে না। পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে লজ্জা আর গ্লানী ছাড়া কিছুই নেই। পরমুখাপেক্ষিতা আর ভিক্ষা করার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টিকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, মদীনার একজন আনসার আল্লাহর নবীর কাছে এলেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ঘরে কি কিছুই নেই?'

লোকটি বললো, 'হ্যাঁ আছে, আমার ঘরে একটি বস্ত্র ও একটি পাত্র রয়েছে।' আল্লাহর নবী লোকটিকে সে দুটো আনতে বললেন। লোকটি তা নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বস্ত্র আর পাত্রটি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে দেখিয়ে বললেন, 'এদুটো কে কিনবে?' একজন সে দুটো জিনিসের দাম এক দিরহাম বললো। আল্লাহর রাসূল পুনরায় বললেন, 'এর চেয়ে বেশী মূল্য কে দিতে পারবে?'

আরেকজন বললো, 'আমি দুই দিরহাম দিবো।' জিনিস দুটো তাঁকে দেয়া হলো এবং দিরহাম দুটো সেই লোকটিকে দিয়ে আল্লাহর রাসূল বললেন, 'এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে নিয়ে যাও এবং অপরটি দিয়ে একটি কুঠার কিনে নিয়ে এসো।' লোকটি কুঠার নিয়ে দরবারে নববীতে এলে আল্লাহর নবী তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে সে কুঠারে হাতল লাগিয়ে দিয়ে লোকটিকে বললেন, 'জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রি করো। পনের দিন আর তোমাকে যেনো না দেখি।'

লোকটি কাঠ কেটে বিক্রি করে বেশ স্বচ্ছল হবার পরে আল্লাহর রাসূলের কাছে এলে তিনি বললেন, 'ভিক্ষার চেয়ে এটা তোমার জন্য মঙ্গলজনক। ভিক্ষা কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কলঙ্কের ছাপ বসিয়ে দিবে।' ইমাম গাজ্জালী ইহ্ইয়া উলুমুদ্দিন কিতাবের তৃতীয় খন্ডে লিখেছেন, 'একশ্রেণীর লোক যাদুর খেলা দেখিয়ে অন্যের পকেটের অর্থ হাতিয়ে নেয়। কেউ আবার সুন্দর আওয়াজে গান গেয়ে টাকা হাতায়, কেউ তাবিজ-তুমার বিক্রি করে, কেউ জ্যোতিষী বা গণকের পেশা গ্রহণ করে। কেউ সুর করে বক্তৃতা দেয় এবং কোনো ধরনের তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা না করে নানা ধরনের কিস্‌সা-কাহিনী বলে মানুষের মন গলিয়ে নিজের পকেট ভারী করে। এদের বক্তৃতা বা ওয়াজ মানুষের জ্ঞানও বৃদ্ধি করে না এবং তাদের চরিত্রে কোনো পরিবর্তনও আনে না। এসবই ভিক্ষা বৃত্তির নামান্তর এবং এসব পরিহার করে পরিশ্রম করা উচিত।'

আমাদের সম্মানিত আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর রাসূলের সেই হাদীসটি উল্লেখ করে থাকেন, যে হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে তাহলে পাখির মতোই রিজিক পেতে।' এই হাদীসের দোহাই দিয়ে তারা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ে এবং বলে, 'আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই খাওয়াবেন।' কিন্তু হাদীসটি তো এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, হাদীসের পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, 'পাখি শূন্য পেটে ভোরে বের হয়ে যায় আর ভরা পেটে সন্ধ্যায় আপন নীড়ে ফিরে আসে।' অর্থাৎ পাখিকে পেট ভরার জন্য ঘর ছেড়ে বের হবার মতো শ্রম তো দিতে হয়, তারপর না তাদের পেট ভরে। সুতরাং হাদীসের মাত্র একটি বাক্যকে অবলম্বন করে কথা বলা উচিত নয়।'একজন গ্রামের মানুষ উটকে না বেঁধে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করলাম। আল্লাহর রাসূল এ কথা শুনে বললেন, 'উটটিকে প্রথমে বাঁধো, তারপর আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করো।'

সূফী সাধকদের জীবনীতে পড়েছি, শাকীক বলখী নামক একজন সাধক লোক রিয্‌কের অন্বেষণে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হলেন। বের হবার পূর্বে তিনি তাঁর বন্ধু ইবরাহীম ইবনে আহ্‌দামের সাথে দেখা করে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে যাবার কথা বলেছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পরেই শাকীক নামক সেই লোককে মসজিদে নামায আদায় করতে দেখে ইবরাহীম ইবনে আহ্‌দাম অবাক-বিস্ময়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি না ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফরে গিয়েছিলেন!' শাকীক বললেন, 'একটি বিস্ময়কর ঘটনা দেখে আমি ফিরে এসেছি।'

তিনি ব্যগ্র কণ্ঠে সেই ঘটনা জানতে চাইলে শাকীক বললেন, 'আমি সফরে গিয়ে এক জনমানবহীন পরিত্যক্ত ঘরে আশ্রয় নিলাম। সেই ঘরে দেখলাম একটি অন্ধ ও পঙ্গু পাখি। পাখিটি চোখেও দেখে না এবং নড়তেও পারে না। আমি ভাবছি, এই পাখিটি এভাবে না খেয়ে জীবিত আছে কিভাবে! কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম, আরেকটি সুস্থ সবল পাখি মুখে করে খাদ্য এনে সেই অন্ধ ও পঙ্গু পাখিটিকে খাওয়াচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে আমি ভাবলাম, যিনি এই অন্ধ ও পঙ্গু পাখির জন্য এভাবে রিয্‌কের ব্যবস্থা করতে পারেন, তিনি তো আমার জন্যও রিয্‌কের ব্যবস্থা করতে পারেন। সুতরাং রিয্‌কের জন্য পরিশ্রম করে দূরে যাবার প্রয়োজন কি! এ কথা ভেবেই আমি ফিরে এসেছি।'

লোকটির কথা শুনে ইবরাহীম ইবনে আহ্‌দাম বললেন, 'শাকীক, আশ্চর্য ব্যাপার! তুমি নিজের ইচ্ছায় কেনো একটি অন্ধ ও পঙ্গু পাখির মতো নিজেকে ভাবতে গেলে! যে পাখিটি ঐ অথর্ব পাখিটিকে এনে খাওয়াচ্ছে, তুমি তার মতো হতে চাওনি কেনো– যে পাখি নিজের জন্যও আহারের ব্যবস্থা করে এবং অন্যের জন্যেও করে!' এ কথা শুনে শাকীক বললো, 'ভাই, তুমি আমার জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়েছো। এখন থেকে আমি পরিশ্রম করেই জীবিকা অর্জন করবো।'

আপনারা কোরআন-হাদীসে অভিজ্ঞ, মক্কা থেকে হিজরত করে যেসব সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় নিঃস্ব অবস্থায় গিয়েছিলেন, সেসব সম্মানিত সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস নিশ্চয়ই আপনাদের জানা রয়েছে। স্মরণ করে দেখুন তো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা হবার কারণে মদীনার আনসারদের কাছে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সম্মান-মর্যাদার পাত্র। মদীনার আনসারবৃন্দ তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কি তাঁরা আনসারদের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন না! কিন্তু তাঁরা পরজীবী হয়ে থাকতে চাননি

এবং এটা ছিলো আল্লাহর রাসূলের শিক্ষার বিপরীত কাজ। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মদীনায় হিজরত করার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার সাহাবী হযরত সায়াদ ইবনে রবীর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

হযরত সায়াদ ছিলেন ধনী মানুষ, তিনি দ্বীনি ভাই হযরত আব্দুর রহমানকে বললেন, 'মদীনার সকলেই জানে যে, আমি ধনী মানুষ। আমি নিজের অর্থ-সম্পদ দুই ভাগ করে এক ভাগ আপনাকে দেবো। আমার দুইজন স্ত্রী রয়েছে, আপনি তাঁদেরকে দেখুন, যাকে আপনার পসন্দ হয় আমি তাকে তালাক দেবো এবং ইদ্দত অতিক্রম করার পর আপনি তাকে বিয়ে করবেন।'

দ্বীনি ভাইয়ের এই প্রস্তাব শুনে হযরত আব্দুর রহমান বিনয়ের সাথে জানালেন, 'ভাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনার পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পর্দে বরকত দান করুন। আমার এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে যদি কোনো বাজার থাকে, তাহলে বাজারের পথটি আমাকে দেখিয়ে দিন।' হযরত সায়াদ তাঁকে মদীনার বনী কাইনুকার বাজার দেখিয়ে দিলেন এবং হযরত আব্দুর রহমান সে বাজারে ব্যবসা করে অচিরেই ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হলেন।

পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল তথা আম্বিয়ায়ে কেরাম কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। কেউ-ই বসে খাননি। পৃথিবীর প্রথম নবী, প্রথম মানুষ এবং প্রথম বিজ্ঞানী হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। হযরত ইদ্রিস আলাইহিস্ সালাম পোশাক শিল্পী ছিলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম লৌহ শিল্পী ছিলেন। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম কাষ্ঠশিল্পী ছিলেন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম পশুপালন করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁরা নিজের হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন, কেউ-ই পরনির্ভরশীল ছিলেন না। সকল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীন– এদের কেউ-ই পরজীবী বা পরমুখাপেক্ষী বেকার ছিলেন না। কারণ পরমুখাপেক্ষীতা নামক রোগ মানুষকে আত্মমর্যাদাহীন, হীনমন্য ও নির্জীব করে তোলে।

আলিম হিসাবে আমাদেরকে এমন অনেক সম্মানিত বিখ্যাত ইমাম বা ইসলামী চিন্তাবিদদের রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ পড়তে হয়, যারা আমাদের কাছে অত্যন্ত

সম্মান-মর্যাদার পাত্র এবং লেখা ও আলোচনায় তাঁদের রচিত কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকি। তাঁদের কথাকে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকি। কিন্তু দেখুন তো, তাঁদের অনেকের নামের সাথে বংশের পদবী নেই, বাপ-দাদার নাম, গোত্রের নাম বা এলাকার নাম যুক্ত নেই। যুক্ত রয়েছে পেশার নাম এবং সেই নামেই তাঁরা পৃথিবীব্যাপী অমর হয়ে রয়েছেন। যেসব পেশার মাধ্যমে তাঁরা স্বয়ং এবং তাঁদের পূর্বপুরুষগণ জীবিকা নির্বাহ করতেন, সেই পেশার নামেই জগৎ জুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। অথচ পেশাভিত্তিক এসব পরিচয়ে তাঁরা এবং ইসলামী সমাজ কখনো কোনো যুগে সামান্যতম লজ্জা বা জড়তা বোধ করেননি ও হীনমন্যতায় আক্রান্ত হননি।

নিকট অতীতে ও বর্তমান সময় থেকে শুরু করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেসব সম্মানিত বুযুর্গ আলিম ব্যক্তিদের নামের সাথে মানুষকে পড়তে হবে, জাস্‌সাস অর্থাৎ কাঁচ ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারক, কাফ্‌ফাল অর্থাৎ তালা প্রস্তুতকারক, কাত্তান অর্থাৎ তুলা উৎপাদনকারী, খাব্বাজ অর্থাৎ রুটি ব্যবসায়ী, খাইয়াত অর্থাৎ দর্জী, বাজ্জাজ অর্থাৎ কাপড় ব্যবসায়ী। এসব সম্মানিত লোকদের পরিচয় নিশ্চয়ই ওলামা সমাজের অগোচরে নেই। এঁরা তো সকলেই ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ-পন্ডিত, ফকীহ্ বা আইনবিদ, লেখক-গবেষক ও চিন্তাবিদ।

কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার মধ্যে লজ্জা বা জড়তা থাকার কোনো কারণই নেই। লজ্জা রয়েছে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার মধ্যে এবং কর্মবিমুখতা ও পরনির্ভরতা মানুষকে স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্রতার পথে নিয়ে যায়। এ কথা আমাদেরকে স্মরণে [illegible] যে, 'বিবেকের ডাকের চেয়ে পেটের ডাকের শক্তি বেশী।' পেটে ক্ষুধা থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ ন্যায়-অন্যায়বোধ ভুলে যায়। এ জন্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দরিদ্রতা কুফরীতে পরিণত হতে পারে।' তিনি মহান আল্লাহর কাছে দরিদ্রতা ও কুফরী থেকে এভাবে পানাহ্ চাইতেন, 'হে আল্লাহ! আমি কুফর ও দরিদ্রতা থেকে পানাহ্ চাই।'

তবে আল হাম্‌দু লিল্লাহ– মহান আল্লাহর শোকর, বর্তমানে আমাদের দেশে মাদ্রাসা ছাত্রদের একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণী লেখাপড়ার পাশাপাশি নানা ধরনের হাতের কাজ শিখছে। বিশেষ করে কম্পিউটারের নানা দিকে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে, যেনো ছাত্র জীবন শেষে বেকারত্বের বোঝা বহন করতে না হয়। বোখারী হাদীসে উল্লেখ

করা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হস্তকর্মের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে অন্য কোনো পবিত্র খাদ্য নেই।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'নামায যখন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো। আর আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।' (সূরা জুমু'আ-১০)

রিয্ক অনুসন্ধানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালাকে বেশী বেশী স্মরণ করতে এ জন্যই বলা হয়েছে যে, রিয্কের ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া বৈধ-অবৈধের মানদন্ড সম্মুখে রাখতে হবে এবং বৈধ রিয্কের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একদিন দেখলেন, মসজিদে নববীতে একদল মানুষ জুমু'আ নামায আদায় করার পর 'আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করলাম' বলেই বসে পড়লো। তখন তিনি ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে নিজের হাতের ছড়ি উঁচু করে বললেন, 'তোমরা কেউ-ই রিয্কের অনুসন্ধান ত্যাগ করে বসে থেকো না। আর বলো না হে আল্লাহ! আমাকে রিয্ক দাও। কারণ আকাশ স্বর্ণ বা রৌপ্য বর্ষণ করে না। আল্লাহ বলেই দিয়েছেন, যখন নামায সমাপ্ত হয় তখন যমীনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।'

সুতরাং অলস বসে থাকা নয় বা মুরিদ এবং ভক্তের দল কখন কে কি দেবে, সে আশায় না থেকে পীর-মুরিদী, ওয়াজ-নসিহত, মাদ্রাসার শিক্ষকতা ও ইমামতী করার ফাঁকে ফাঁকে হালাল পথে বাড়তি উপার্জনের জন্য শ্রম দিতে হবে। আমার জানা মতে চট্টগ্রামের বায়তুশ শরফের পীর শায়খুল হাদীস শাহ্ আব্দুল জব্বার (রাহঃ) সংসার পরিচালনার জন্য আতর এবং মধুর ব্যবসা করতেন। সুতরাং উপার্জনের বহু ক্ষেত্র রয়েছে তা অনুসন্ধান করে বের করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ শিক্ষককে অনুসরণ করতে পারি। কাজ ছোট হোক বা বড় হোক, বৈধ কাজে কেনো লজ্জা বা জড়তা থাকা উচিত নয়।

দুইজন নবীর মাযারে

ঈস্কান্দারিয়া শহরে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান দেখতে দেখতে যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেলো। এই শহরেই রয়েছে হযরত দানিয়েল আলাইহিস্ সালামের নামে একটি মসজিদ 'মসজিদে দানিয়েল'। এই মসজিদে নামায আদায় করলাম। এই মসজিদের পাশের রয়েছে হযরত লুকমান হাকিম ও হযরত দানিয়েল আলাইহিস্ সালামের কবর। কবর দুটো যিয়ারত করার জন্য দাঁড়াতেই মনের মধ্যে বিশেষ এক অনুভূতির উদয় হলো। এই তো সেই দুই মহান ব্যক্তি, এখানে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যাঁরা সাধারণ মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে আহ্বান জানিয়েছেন। হযরত লুকমান তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।

এরপর গেলাম ঈস্কান্দারিয়া শহরের কেন্দ্রস্থলে। এখানে রয়েছে বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবি দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কবর। তিনি ছিলেন আনসার সাহাবী। কোথায় সেই পবিত্র ভূমি মদীনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর আজ সুদূর এই মিসরের মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন। কোরআন-হাদীসের শিক্ষায় মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার জন্যই তাঁরা এভাবে দেশ থেকে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন আমির আবার কেউ বলেছেন উয়াইমির। দারদা হলো তাঁর মেয়ের নাম, এ জন্যই তাঁকে আবি দারদা বা দারদার পিতা নামে ডাকা হতো এবং এই নামেই তিনি পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন।

তিনি ছিলেন আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, অশ্বারোহী ও বিচারক। কর্ম জীবনে ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে আবি দারদা হলো একজন মহাজ্ঞানী হাকিম।' আল্লাহর কাছে হিসাব দেয়ার ব্যাপারে তিনি সব সময় থরথর করে কাঁপতেন। একদিন মসজিদে খুতবা দিতে গিয়ে তিনি নিজের সম্পর্কে বললেন, 'আমি সেই দিনের ব্যাপারে খুবই ভয় করি, যেদিন আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি তোমার জ্ঞান অনুসারে কাজ করেছো? যেদিন কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত জীবন্তরূপে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে এবং প্রশ্ন করবে, তুমি কোরআনের নির্দেশ কতটুকু পালন করেছো? কোরআনের নির্দেশসূচক আয়াত তখন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে এবং বলবে তুমি কিছুই পালন করোনি। এরপর

কোরআনের নিষধসূচক আয়াত আমাকে সেদিন প্রশ্ন করবে, তুমি কোরআনের নিষেধ থেকে কতটুকু দূরে থেকেছো? নিষেধসূচক আয়াত তখন বলবে, তুমি কিছুই করোনি। হে মানুষ! আমি সেদিন মুক্তি পাবো?'

মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'মৃত্যুর পরে যে কী হবে তা যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তাহলে তৃপ্তির সাথে খেতে পারতে না এবং রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছায়াও যেতে না, বরং রাস্তায় বের হয়ে বুক চাপ্‌ড়িয়ে কাঁদতে।'

মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত এই বিখ্যাত মণীষীর কবর যিয়ারত করে ভূমধ্যসাগরের তীরে একটি রেস্টুরেন্টে মিসরীয় ঐতিহ্যবাহী খানা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম পৃথিবী বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী দেখার উদ্দেশ্যে।

গ্রন্থের ভুবনে

এই ঈস্কান্দারিয়া শহরেই রয়েছে পৃথিবীর প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের একটি 'ফারোস বাতিঘর বা দেটরম্রে ীধথর্দদমল্রণ' এই লাইট হাউসটি ফেরাউস দ্বীপের তীরের মাটি থেকে প্রায় ১৫০ ফুট এগিয়ে পানির মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বীপটি দীর্ঘ একটি বাঁধ দিয়ে মূল ভূখন্ডের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এই লাইট হাউসটি নির্মাণ করা হয়েছিলো খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২৯০ সালে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই লাইট হাউস নির্মাণ করার জন্য রাজা টলেমি সুটার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এটি দেখে যেতে পারেননি। তাঁর পুত্র টলেমি ফিলাডেলফাসের শাসনামলে এটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

ফাউন্ডেশনের বেজসহ এই লাইট হাউসের উচ্চতা তখন ছিলো প্রায় ৩৮৪ ফুট– যা বর্তমানকালের ৪০ তলা বিল্ডিংয়ের উচ্চতার সমান। এই বাতিঘরের সবথেকে আশ্চর্যের দিক হলো, সেই প্রাচীন যুগে সাগরের অশান্ত পানির মধ্যে দীর্ঘ উচ্চতায় এটি কিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিলো। পানির ওপর নির্মিত এই লাইট হাউসে ব্রীজ দিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ইউনিভার্সিটির কমার্স ফ্যাকাল্টির উল্টো দিকে বিশ্ববিখ্যাত এই লাইব্রেরীটি অবস্থিত। এটির নির্মাণ শৈলী বা কাঠামো এক কথায় অপূর্ব। এই ভবনের ছাদ এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গোটা লাইব্রেরী সূর্যের আলোয় আলোকিত থাকে। বই-পত্রে যে ছত্রাক জমে গ্রন্থসমূহ ধ্বংস করে দেয়, তা থেকে রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। কারণ সূর্যের আলো বই-পত্রে

জমে থাকা ছত্রাক ধ্বংস করে দেয়। এই লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে খৃষ্টপূর্ব ২৮৮ সালে। বর্তমানে লাইব্রেরীটি আধুনিকীকরণে ব্যয় হয়েছে ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম লাইব্রেরী হিসেবে এখানে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ের ৮০ লক্ষ বই-কিতাব। ৩ টি মিউজিয়াম, ১ টি কন্‌ফারেন্স হল, প্রায় ৫ হাজার কম্পিউটার সমৃদ্ধ গবেষণাগার। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার সম্পূর্ণ ফ্রী।

মেহমানদের সম্মানে সম্বর্ধনা

সময় স্বল্পতার কারণে ঈস্কান্দারিয়া নগরীর প্রত্যেকটি দর্শনীয় এলাকা বা জিনিস দেখার সৌভাগ্য হলো না। উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান দেখা শেষ করে স্থানীয় সময় বিকাল চারটার দিকে আমরা ফিরে চললাম মিসরের রাজধানী কায়রোর উদ্দেশ্যে। এই শহর ত্যাগ করার সময় মনকে বার বার নাড়া দিতে থাকলো হযরত লুকমান হাকিমের ইতিহাস। মহান আল্লাহর কোরআনে তিনি অমর হয়ে রয়েছেন। আজ সারাদিনে প্রায় ৫০০ কিলোমিটারের অধিক সফর করেছি। ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কায়রোর বাসায় ফিরে এলাম। সামান্যক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করার সুযোগ মিললো। কারণ একটু পরেই পুনরায় বের হতে হবে।

হালকা চা-নাস্তা সেরে নিলাম, ইতোমধ্যে আমাদের গাইড সদাহাস্যমুখ আব্দুল কাদের এসে জানালো, 'স্যার, চলুন আমরা সকলেই প্রস্তুত।' নীচে নেমে এসে গাড়িতে উঠলাম। রাতের কায়রো সে আরেক স্বপ্নপুরী। অসংখ্য সোডিয়াম লাইট ও নিয়ন সাইনের ঝলকানীতে চোখে ধাঁ-ধাঁ লাগার মতো বাহারী সৌন্দর্য। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ডানে ফেলে এবং প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত-এর নিহত হবার স্থান ও তার কবর বাঁমে রেখে আমরা পৌঁছে গেলাম শহরের কেন্দ্রস্থলে রাবেয়া আল আদাবিয়্যা হলে। এখানেই আমাদের জন্য সম্বর্ধনার আয়োজন করেছে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্ররা।

রাবেয়া আল আদাবিয়্যা হলে প্রবেশ করতেই দেখতে পেলাম হল ভর্তি ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্য পেশার লোকজন। নানা রঙের ফুলের তোড়া দিয়ে তারা আমাদেরকে বরণ করে নিলো। শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করে তারপর আরবী ও বাংলায় মানপত্র প্রদানের পর বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করলো এটিএন বাংলার আরকান উল্লাহ হারুনী ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআনিক সাইন্স

এবং ইসলামীক ষ্ট্যাডিস-এর অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন তালুকদার। এরপর আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমাকে কিছু বলতে হলো। পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হলো।

শায়খুল আযহারের সাথে সাক্ষাৎ

আজ ১১/০৪/২০০৫ তারিখ, আমার মিসর সফরের শেষদিন। আজ আমরা সাক্ষাৎ করতে যাবো আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তথা শায়খুল আযহারের সাথে। সাক্ষাতের সময় ছিলো সকাল ১০ টা। সকালের নাস্তা সেরে উপস্থিত বাংলাদেশী ছাত্রদের সাথে নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতেই সময় হয়ে এলো। নির্ধারিত সময়ে আমাদের গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল গেট পার হয়ে শায়খুল আযহারের অফিসের সম্মুখে পৌছতেই সম্মানিত ভিসির সেক্রেটারী এবং অফিসের অন্যান্যরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন।

শায়খুল আযহার বা ভাইস চ্যান্সেলরের নাম ডক্টর মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানতাবী। তিনি পদাধিকার বলে মিসরের গ্র্যান্ড ইমাম বা ইমামুল আকবার। ডক্টর তানতাবী মিসরের তামা শহরের সুলেম আল শারকিয়া গ্রামে ১৯২৮ সালের ২৮ শে অক্টোবর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে পবিত্র কোরআন হেফজ করার পর তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর ঈস্কান্দারিয়া রিলিজিয়াস ইন্সটিটিউট-এর উসুলুদ্দিন ফ্যাকাল্টির অধীনে ১৯৫৮ সালে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৬৬ সালে ট্র্যাডিশন এন্ড কমেন্টারি-তে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৬৮ সালে উসুলুদ্দিন ফ্যাকাল্টিতে শিক্ষকতা শুরু করে ১৯৭৬ সালে ডীন পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্ট্যাডিস ফ্যাকাল্টিতে ডীন হিসেবে যোগদান করেন। তিনি লিবিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। এরপর কিছুকাল পর ৫৮ বছর বয়সে ১৯৮৬ সালের ২৮ শে অক্টোবর মুফতি হিসেবে নিয়োগ পান। এর ১০ বছর পর ১৯৯৬ সালের ২৭ শে মার্চ ৬৮ বছর বয়সে আল আযহারের গ্র্যান্ড শায়েখ তথা ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পান। শায়খুল আযহার– এই পদটি একটি সাংবিধানিক পদ এবং এই পদে নিয়োগ পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশের প্রেসিডেন্ট করে থাকেন।

তিনি উচ্চ পর্যায়ের গবেষক এবং আত্তাফসীর আলওয়াসেত নামক গবেষণাধর্মী গ্রন্থসহ বহু মূল্যবান কিতাবের রচয়িতা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শায়খুল আযহারের সুসজ্জিত কক্ষে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো। পৃথিবী বিখ্যাত আলেম শায়খুল আযহার আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। আমরা পরস্পরে কুশল বিনিময় করলাম। আমাদের জন্য সময় বরাদ্দ ছিলো খুবই কম। কারণ আমাদের পূর্বে আরো কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদুত ও পদস্থ কর্মকর্তার সাথে আগে থেকেই এপয়েন্টমেন্ট করা ছিলো।

তবুও যেটুকু সুযোগ পেয়েছি, তা নিজের দেশের স্বার্থে ব্যবহার করতে ছাড়লাম না। আমি আমার আলোচনায় শায়খুল আযহারকে বললাম, বাংলাদেশ পৃথিবীর ১৪ কোটি মুসলিম অধ্যুষিত দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। অন্যান্য মুসলিম দেশের তুলনায় আমাদের দেশ থেকে আল আযহারে প্রতি বছর ছাত্র আনার কোটা মাত্র ১৫ জন– যা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। সুতরাং আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র আনার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম।

আমার কথার জবাবে শায়খুল আযহার বললেন, বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে অবশ্যই আমরা বাংলাদেশের জন্য সহানুভূতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

এবার এলো বিদায়ের পালা। আমি তাঁকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর দুয়া নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম।

সবারই বুকে কি যেনো এক অব্যক্ত বেদনা

মিসরে এটাই ছিলো আমার জীবনের প্রথম সফর। এ ছাড়া মুসলিম দেশ হিসেবে মিসরের প্রতি আমার স্বাভাবিক এক অদম্য আকর্ষণও ছিলো। এই মিসরের মাটিতে মহান আল্লাহর নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ও আইয়াম্মে মুজতাহিদীন বিচরণ করেছেন। এই মাটিতেই রচিত হয়েছে কোরআন-হাদীস ভিত্তিক অসংখ্য মূল্যবান কিতাব– যা নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী কাফেলা ইখওয়ানুল মুসলিমীন দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এই সংগঠনের নেতা-কর্মীবৃন্দ শাহাদাতবরণ করেছেন এবং অকল্পনীয় লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁদের সীমাহীন আত্মত্যাগ মিসরের সাধারণ মানুষের ওপরে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, তা কাছ থেকে দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিলো।

আল হাম্‌দুলিল্লাহ্‌– ইখওয়ানুল মুসলিমীনের নেতা-কর্মীদের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি এবং তাঁদের কর্মতৎপরতার কারণেই মিসরের সাধারণ মানুষ আল্লাহর কোরআনকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে পাবার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে। আমি যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষন করতে দেখেছি এবং আমি বাংলাদেশের সংসদ সদস্য ও সংসদে কোরআনের কথা বলি, এ কথা জানতে পেরে তারা আমার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। বিশেষ করে মিসরের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিনয়ী ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। সফরকালে যেখানে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, সেখানেই তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। তারা হাসিমুখে সালাম বিনিময় করেছে।

সেনা কর্মকর্তা, সাধারণ সেনাসদস্য, পুলিশ কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্য এবং নিরাপত্তা রক্ষায় অন্যান্য লোকদের মধ্যে আলেম-ওলামাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এক সহজাত প্রবৃত্তি লক্ষ্য করেছি। এদের মধুর আচরণ দেখে মনে হয়েছে, শহীদ হাসান আল বান্না, শহীদ আব্দুল কাদির আওদাহ, শহীদ সাইয়্যেদ কুতুবসহ অসংখ্য শহীদ আর জয়নব আল গাজালীদের অতুলনীয় ও অবর্ণনীয় শ্রম, দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন সহ্য করা এবং রক্ত ঝরানো আন্দোলন বৃথা যায়নি। গোটা জাতির দিকে দৃষ্টি দিলে মনে হবে, জাতির অধিকাংশ সদস্য চাপা ক্ষোভ নিয়ে দিন কাটায়। কি যেনো এক অব্যক্ত বেদনা দিনরাত তাদেরকে অহর্নিশি ঘুনের মতোই কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

তাঁরা হাসি মুখে কথা বলছে, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে যেনো প্রাণের স্পন্দন নেই। বুকের মধ্যে জমাট বাঁধা হাহাকার যেনো ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাসের মতোই কণ্ঠচিরে বেরিয়ে আসছে। কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে বুক উজাড় করে কি যেনো তারা বলতে চায়– কিন্তু সরকারী বাঁধন-কোষনের কারণে বলতে পারে না। মহান আল্লাহর বিধান না পাবার বেদনায় বোবা কাঁন্না তাদের মনের গহীনে মাথা কুটে ফিরছে। অনেক অনেক কথা তাদের বুকের মধ্যে বরফের মতোই জমাট বেঁধে রয়েছে, তারা সব বলতে চায়- কিন্তু এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেনো তারা বোবা হয়ে যায়। মনে হয় যেনো তাদের সকলের মাথার ওপরেই সরকারী অদৃশ্য খড়গ ঝুলছে, মুখ ফুটে কিছু বললেই স্ববেগে সেই খড়গ নেমে আসবে।

সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন কার পাশে যে রয়েছে, তা কেউ-ই জানে না। সরকারের ইসলামের বিপরীত কর্মকান্ডের সমালোচনা কেউ করলে, যে কোনো সময় সে ব্যক্তি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। সেই অজ্ঞাত স্থানগুলো নাকি নির্মাণ করা হয়েছে মরুভূমির বালির নীচে। এসব স্থানে একবার কেউ গেলে আর ফিরে আসে না, সৌভাগ্যবশত কেউ ফিরে এলেও জীবনের মতো পঙ্গু হয়েই ফিরে আসতে হয়। রাত যতো বেশী হয় সূর্য উদয়ের সময় ততোই ঘনিয়ে আসে। সুতরাং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত লোকদের ওপর নির্যাতন যতো বৃদ্ধি পাবে, আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবার সম্ভাবনাও ততোই প্রবল হবে– এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

মিসরে সার্বিক অবস্থা দেখে আমার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, মিসর ইসলামী বিপ্লবের এক উর্বর ভুখন্ড। অগণিত শহীদের রক্ত এই ভূমিতে তপ্তরক্তের বারি সিঞ্চন করে কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছে। প্রয়োজন শুধু একজন সালাহউদ্দিনের– গোটা জাতি সেই সালাহউদ্দিনের জন্য প্রতীক্ষা করছে। যিনি সময়োপযোগী সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে মিসরের মুসলমানদেরকে স্বৈরশাসকের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিবেন।

বিদায়! মিসর

আজ ১২/০৪/০৫ তারিখ, আজ আমরা মিসর থেকে নিজ দেশের পথে রওয়ানা হবো। আরো কয়েক সপ্তাহ মিসরে থাকা সম্ভব হলে মিসরের সবটা দেখা হয়ত সম্ভব হতো। কিন্তু নানাবিধ ব্যস্ততার কারণেই দেশে ফিরতে হবে, এ কারণে মিসরে আর থাকা সম্ভব হলো না। গতকাল থেকেই আমার মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলো যে, আজই আমার মিসর সফরের শেষ দিন।

মিসর নামক এই দেশ– যেখানে হযরত ইবরাহীম, হযরত ইউসুফ, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত ইলিয়াস, হযরত সালেহ্, হযরত লূকমান ও হযরত দানিয়েল আলাইহিমুস সালামসহ নাম না জানা কত নবী-রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরাম এসেছেন।

মহান আল্লাহর অগণিত মাহবুব বান্দার পবিত্র পদরেণু এই মিসরের মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদিতে মিশে রয়েছে। তাঁরা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন এই মিসরের মাটিতেই। পুনরায় এই মিসর সফরে আসা হবে কিনা মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

ের ত্যাগের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। মিসরে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের মধ্যে যাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাঁরা আমাদেরকে বিদায় জানানোর জন্য বিমান বন্দরে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে জামে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রদের মধ্যে যারা এ কয়েকদিন আমাদের জন্য ক্লান্তিহীন শ্রম দিয়েছে, আমি তাদের চেহারার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। এদের সকলেরই চেহারায় প্রিয়জন বিচ্ছেদের মর্মবেদনার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চোখ দুটোয় অশ্রু টলমল করছে।

সত্যই গত কয়েকদিন এরা প্রতিযোগিতা করে আমাদের জন্য শ্রম দিয়েছে। শ্রম এবং বিনিময়– এ দুটো শব্দ একটির সাথে আরেকটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রম দেয়ার উদ্দেশ্যই হলো বিনিময় লাভ। সুস্থ জ্ঞান-বিবেক সম্পন্ন মানুষ এমন শ্রমে নিজেকে নিয়োজিত করবে না, যেখানে কোনো বিনিময় পাওয়া যাবে না। আমরা মিসরে আসা থেকে বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত যারা আমাদের জন্য অক্লান্ত শ্রম দিয়েছে, এরাও তো বিনিময়ের আশায়ই শ্রম দিয়েছে। তবে সে বিনিময় নগদ অর্থে নয়।

পার্থিব এই জগতে নগদ প্রাপ্তির আশায় এরা গত কয়েকদিন এভাবে শ্রম দেয়নি। এরা সেই বিনিময়ের আশায় শ্রম দিয়েছে, যে বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদালতে আখিরাতে দিবেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তাদেরকে আলেমে রব্বানী-হাক্কানী বানিয়ে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন।

প্রাণভরে উপস্থিত সকলের সাথেই কোলাকুলি করলাম, তারপর ইমিগ্রেশনের ঝামেলা শেষ করে নির্ধারিত ফ্লাইটের দিকে এগিয়ে গেলাম। ফ্লাইটের দিকে আমি এগিয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে পা দুটো আর এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করছে না। বার বার আমি পেছন ফিরে শেষ বারের মতো তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করছি মহান আল্লাহর নবী-রাসূলদের স্মৃতি বিজড়িত মিসরকে। স্পষ্ট অনুভব করছি, একটা বেদনাবোধ আমার বুকের ভেতরে গুমরে উঠছে। এ তো সেই মিসর– যেখানে দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যাঁরাই চেষ্টা-সাধনা শুরু করেছেন, তাঁদের প্রতিই নেমে এসেছে বাতিল শক্তির নির্মম নিষ্ঠুর অবর্ণনীয় নির্যাতন।

নিকট অতীতে দ্বীনের দা'য়ী হাসানুল বান্নাকে বুকের তপ্ত রক্ত রাজপথে ঢেলে দিতে হয়েছে। সাইয়্যেদ কুতুব, আব্দুল কাদের আওদাহসহ কালের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে

ফাঁসির রশিতে ঝুলতে হয়েছে। অগণিত নারী-পুরুষকে চিরতরে পঙ্গুত্ববরণ করতে হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্তও হাজার-হাজার মানুষ কারাগারে অথবা কারাগারের বাইরে নির্মম নির্যাতনের মধ্যে রয়েছে।

বুকের কষ্ট বুকে নিয়েই ফ্লাইটে উঠলাম। নিজেকে চিন্তা মুক্ত রাখার চেষ্টা করেও পারলাম না, মিসরে প্রতিকুল পরিবেশে যাঁরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, তাঁদের কথা ভাবতে ভাবতেই এক সময় দুবাই এয়ারপোর্টে পৌছে গেলাম। এখানে প্রায় দুই ঘন্টার যাত্রা বিরতি। এখান থেকেই পরবর্তী ফ্লাইটে আমরা মাতৃভূমি বাংলাদেশের দিকে রওয়ানা হবো। ভাবছিলাম, যাত্রা বিরতির এই সময় কিভাবে কাজে লাগাবো। অপ্রত্যাশিতভাবে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সে ব্যবস্থাও এমনভাবে করলেন যে, মনে হলো– যদি আরো কয়েক ঘন্টা সময় পেতাম, তাহলে মনের ভার অনেকটাই লাঘব হয়ে যেতো।

মালয়েশিয়ার ইসলামী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ও সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহীম সাহেবকে দুবাই এয়ারপোর্টে পেয়ে গেলাম। আমরা পরস্পরে পূর্ব পরিচিত। তিনিও এখান থেকে পরবর্তী ফ্লাইটে লন্ডন সফর করবেন। তাঁকে দেখে আমার মনের অবস্থা যেমন হলো, তাঁর চেহারাতেও সেই একই অনুভূতির অভিব্যক্তি প্রকাশ পেলো। আমরা দু'জনই তো সেই একই পথ বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, পার্থিব জগতে যে পথের বাঁকে বাঁকে রয়েছে আবু জেহেল আর আবু লাহাবের দল। অগণিত খানাখন্দে পরিপূর্ণ বিপদ-সঙ্কুল বন্ধুর এই পথ বেয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

এ পথে চলতে গেলে অগণিত চেহারা চারদিক থেকে বিভৎস ভঙ্গিতে স্বাগত জানায়। কলিজা কাঁপিয়ে দেয়ার মতো ভয়ঙ্কর চেহারা দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরে। প্রত্যেক পদক্ষেপে মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী থাকলে এ পথে চলতে গেলে ভয়-ভীতি স্পর্শও করতে পারে না। সেই কিশোর বয়স থেকেই এই পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছি, বর্তমানে বয়সের একপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। মহান আল্লাহই জানেন, আর কতদিন এ পথে চলার সুযোগ আমি পাবো।

আনোয়ার ইবরাহীম এবং আমি– আমরা দু'জনই পৃথক দুটো দেশের নাগরিক এবং আমাদের ভাষাও পৃথক। কিন্তু মহান আল্লাহর কোরআন আমাদেরকে একই সুতোয় বেঁধে দিয়েছে। এমনভাবে বেঁধে দিয়েছে যে, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও পার্থিব জগতে জীবন পরিচালনা প্রণালী সবই একই সুত্রে আবদ্ধ করে দিয়েছে। এ তো

গেলো বাহ্যিক দিক, চিন্তার জগতেও আমাদেরকে একই পথের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। পরস্পরের সাথে দেখা নেই– কিন্তু উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে শত যোজন দূরে অবস্থান করেও আমরা সেই একই সমস্যা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করছি। আমাদের লক্ষ্য, কিভাবে সমস্যা সঙ্কুল ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীকে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, ভীতিহীন, নিরাপত্তাপূর্ণ বাসযোগ্য স্থানে পরিণত করা যায়।

একমাত্র ইসলামই আমাদের উভয়ের বাইরের ও ভেতরের জগতকে এক জগতে পরিণত করেছে।

বর্তমান পৃথিবীতে মুসলমান ও মুসলিম দেশের সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। বর্তমান পৃথিবীতে মুসলিম মিল্লাত এমন এক ক্রান্তিকাল তথা দুঃসময় অতিবাহিত করছে, এই অবস্থা মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাসে ইতোপূর্বে আর আসেনি। সর্বত্র মুসলিমরাই নির্যাতিত হচ্ছে। সময়ের প্রত্যেক প্রহরে মুসলমানদের রক্তে এই পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থান রঞ্জিত হচ্ছে। মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক ও বৃদ্ধদের করুণ আর্তনাদে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

চতুষ্পদ প্রাণীগুলো পৃথিবীতে যে অধিকার ভোগ করছে, মুসলমানরা সে অধিকারটুকুও পাচ্ছে না। শত্রুপক্ষ নিজেদের মনোভাবকে মুসলমানদের মনোভাব হিসেবে পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য-চলচ্চিত্র ও সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ এবং প্রচার করে দুনিয়ার সম্মুখে মুসলমানদেরকে অপমানিত-লাঞ্ছিত করছে। মুসলমানদের মুখে সন্ত্রাসের মুখোশ পরিয়ে পৃথিবীর মানুষের কাছে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী জাতি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অধিকার বঞ্চিত এই মজলুম মুসলিম মিল্লাত কিভাবে এই করুণ অবস্থা অতিক্রম করবে– আমাদের আলোচনার সবটুকুই এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিলো।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মালয়েশিয়ার সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী মুহতারাম আনোয়ার ইবরাহীম সাহেবের মধ্যে যেমন দিয়েছেন নেতৃত্বের যোগ্যতা, তেমনি দিয়েছেন চিন্তার রাজ্যে গভীরতা। তিনি আলোচনা করছিলেন, তাঁর আলোচনার প্রত্যেকটি শব্দই ছিলো মুসলিম মিল্লাতের জন্য মহামূল্যবান হীরক খন্ডের সমতুল্য।

তাঁর সাথে যখন আমার আলোচনা হচ্ছিলো, তখন যেনো আমি ভুলে গিয়েছিলাম– আমি নিজ দেশে ফিরে যাবার জন্য দুবাই এয়ারপোর্টে যাত্রা বিরতি করেছি এবং আমরা দু'জনই কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ বিপরীত দুই পথে যাত্রা করবো। পৃথিবীর কোনো কিছুই তো স্থায়ী নয়– আমাদের আলোচনাও বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলো– আমাদেরকে এখুনি নিজ নিজ গন্তব্যে রওয়ানা হবার জন্য ফ্লাইটে উঠতে হবে।

লাউড স্পীকারে ঘোষণা শুনেই পুনরায় একটা বিচ্ছেদ বেদনা আমাকে ঘীরে ধরলো। লক্ষ্য করলাম, মুহতারাম আনোয়ার ইবরাহীম সাহেবের মুখমন্ডলেও এক মলিনভাব ফুটে উঠেছে। আমরা পরস্পরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলাম। ফ্লাইটে উঠে নির্ধারিত সীটে বসলাম। ক্ষণপূর্বে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণে আনোয়ার ইবরাহীম সাহেবের বলা মূল্যবান কথাগুলো তখন পর্যন্ত চিন্তার জগতকে আলোড়িত করছে।

সীটের পেছনের দিকে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসলাম। একদিকে মুসলমানদের বর্তমান করুণ অবস্থার চিত্র একটির পরে আরেকটি এসে চোখের পাতায় ভীড় জমাচ্ছে– অপরদিকে ক্ষণপূর্বে শোনা মালয়েশিয়ার সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহীম সাহেবের কথাগুলো কানের কাছে ঝঙ্কার তুলছে।

সেদিন কতদূরে– যেদিন মুসলমানরা বর্তমান এই করুণ অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবে!

সেই দিন আর কত দূরে– যেদিন মুসলমানরা বুকভরে মুক্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে সক্ষম হবে!

মুসলমানদের জন্য এই তিমিরাচ্ছন্ন সূচীভেদ্য ঘনকালো অন্ধকার আর কতদিন পরে দূরিভূত হবে!

হেরার রাজতোরণ কতদিন পরে কখন পুনরায় সারা দুনিয়াকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করবে!

সেই আকাশ- সেই বাতাস- সেই পৃথিবী কবে কোনদিন ভাগ্যে জুটবে, যেখানে মুসলিম মিল্লাতের ক্রন্দন রোল ধ্বনিত হবে না!

এই কথাগুলো আমার মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিলো যে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম– আমি মহাশূন্যে ভাসমান উড়োজাহাজের যাত্রী। আমার চারপাশের সবকিছুই যেনো আমার কাছে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়েছিলো।

হঠাৎ আমার চিন্তার সুত্রগুলো ছিন্ন হয়ে গেলো। কানে ভেসে এলো লাউড স্পীকারের যান্ত্রিক শব্দ, 'আমরা আর অল্প কিছুক্ষণ পরেই ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি'– এ কথা ঘোষক লাউড স্পীকারের মাধ্যমে যাত্রীদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ঘোষকের ঘোষণায় আমিও সম্বিৎ ফীরে পেলাম, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, আমাদেরকে নিয়ে বিশাল জাম্বোজেটটি ঢাকায় পৌঁছে গিয়েছে। মুহতারাম আনোয়ার ইবরাহীম সাহেবের বলা কথাগুলো আমাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিলো যে, আমি বুঝতেই পারিনি দুবাই থেকে ঢাকা– মাঝের এতটা সময় কখন কোন দিক দিয়ে পার হয়ে গিয়েছে।